অ্যান্টিবায়োটিক

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

অ্যান্টিবায়োটিক
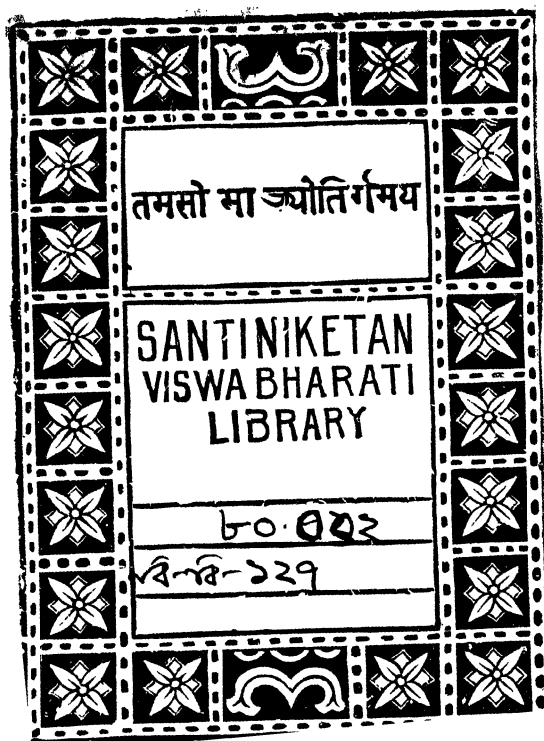
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বলা হয় পরমাণু ও অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধসমূহ বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করেছে। বাংলার বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক-মহলের এই বিষয়ে কৌতূহল মেটাতে আমার এই প্রচেষ্টা যদি সক্ষম হয় তা হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

অ্যান্টিবায়োটিক-প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এই পুস্তকটি প্রধানতঃ তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। বাংলাভাষায় অ্যান্টিবায়োটিক বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করবার জন্য যুগান্তরের বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে যে উৎসাহ দান ও সহায়তা করেছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য বন্ধুবর শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তীর কাছেও আমি একান্তভাবে ঋণী।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি
কালটিভেশন অব সায়েন্স
কলিকাতা ৩২

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরস্পরের বৃদ্ধি রোধ করবার চেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ রোগের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে পারে। পাস্তুরের পরে অনেক বিজ্ঞানীই নানা গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান, কিন্তু পেনিসিলিন এবং অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারই এই বিষয়কে বিজ্ঞানী মহলে অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেনিসিলিনের আবির্ভাব এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে হয়েছিল। আবিষ্কর্তা জীবাণু-বিজ্ঞানী ডা. আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং লণ্ডনের সেণ্টমেরী হাসপাতালে স্টেফাইলোকক্কাস জীবাণুর বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করছিলেন, হঠাৎ একদিন তার গবেষণা-মাধ্যমের উপরে সবুজ একটি ছত্রকের আবির্ভাব ঘটলো। বাতাস কর্তৃক বাহিত হয়ে ঐ ছত্রকের বীজ কিভাবে গবেষণা-মাধ্যমের মধ্যে এসে পড়ে সবুজ এক ছত্রকের সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানী ফ্লেমিং অনাহূত পদার্থের আবির্ভাবে বিচলিত হয়ে উঠলেন; গবেষণা-মাধ্যম প্রস্তুত করার সময় বোধ হয় সহকারীর অসাবধানতায় বাতাস থেকে এই ছত্রকটির বীজ সংক্রামিত হয়েছে তাই সহকারীর কপালে জুটল তিরস্কার। বিজ্ঞানী একটি চামচে করে সবুজ পদার্থটি তুলে নিয়ে গবেষণা-মাধ্যমটিকে সরিয়ে রেখে দিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করলেন।

কয়েকদিন পরের কথা, হঠাৎ ডা. ফ্লেমিংএর ঐ পুরোনো গবেষণা-মাধ্যমের বীজাণুগুলির দিকে চোখ পড়ল। অবাক কাণ্ড, যেখানে ঐ সবুজ ময়লাটা পড়েছিল সেখানকার চার দিকের স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুগুলি গলে গেছে। বিজ্ঞানী হতবাক হয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন— তবে কি ঐ সবুজ ময়লাটার মধ্যে এমন-কিছু ছিল যা মানুষের মহাশত্রু এই বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম! খোঁজ পড়ল ঐ ময়লাটার, সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য বলতে হবে যে-কোনো কারণেই হোক চামচেটা ধোওয়া হয় নি। বিজ্ঞানী ফ্লেমিং পরীক্ষা করে দেখলেন, সবুজ ময়লাটি পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক একটি

ছত্রক এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি অতুলনীয় রাসায়নিক পদার্থ যা বহু প্রকার জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করতে পারে। রোগ-নিরাময়কল্পে বস্তুটির অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল, ছত্রকটির গোষ্ঠীর নাম অনুসারে পদার্থটির নামকরণ হল পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হল ১৯২৯ সালে, কিন্তু বিশুদ্ধ পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল আরও কয়েক বছর। ডা. ফ্লেমিং নিজে চিকিৎসার কাজে পেনিসিলিন ব্যবহার করেন নি, বিভিন্ন রোগজীবাণুর বৃদ্ধির উপর এই পদার্থের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এর পর প্রচুর পরিমাণে পেনি-সিলিন উৎপাদনের কাজে মনোনিবেশ করলেন লণ্ডন স্কুল অব্ হাইজিন অ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ছত্রক-রাসায়নিক ডা. হ্যারোল্ড রাইস্ট্রিক। তিনি এই বস্তুটির শরীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া বিশদভাবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল অব্ হাইজিন অ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কর্তৃপক্ষ তাঁকে রোগীদের উপর গবেষণার সুযোগ দিলেন না। উপরন্তু বস্তুটি অতি অস্থায়ী এবং এর উৎপাদন খুবই কম হওয়ার জন্য প্রায় বিরক্ত হয়েই বিজ্ঞানী রাইস্ট্রিক পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা পরিত্যাগ করলেন। ১৯৩৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজির অধ্যাপক ডা. ফ্লোরি তাঁর গবেষকবৃন্দ নিয়ে পেনিসিলিনের শরীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া ও রোগনিরাময়-ক্ষমতা নির্ধারণকল্পে শুরু করলেন গবেষণা। পেনিসিলিনের জীবাণু নাশ করার অসাধারণ ক্ষমতার কথা বিজ্ঞানী-মহলে তখন যথেষ্ট প্রচলিত, তাই সকলের দৃষ্টি পড়ল মানবদেহে এর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করবার জন্য। তখন যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধের প্রয়োজনেই বিজ্ঞানীমহল এই গবেষণায় আরও তৎপর হয়ে উঠলেন। বহু চেষ্টায় ফ্লোরি ও তাঁর সহকর্মীরা কয়েকটি রোগীর উপর পরীক্ষা করার মতো সামান্য পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদন করে প্রয়োগ করলেন; এই ঔষধের রোগনিরাময়কারী অলৌকিক ক্ষমতার আত্মপ্রকাশ ঘটল— রোগীরা অবিলম্বে রোগমুক্ত হলেন।

পেনিসিলিন উৎপাদন করতে হবে প্রচুর পরিমাণে, সেজন্যে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। যুদ্ধের আক্রমণে ইংলণ্ড তখন বিপন্ন, তাই ইংলণ্ডে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করার অনেক অসুবিধা দেখা গেল। কিন্তু যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসায় এই পদার্থের অসাধারণ মূল্য সকলেই বুঝতে পেরেছেন, গবেষণায় আর বিলম্ব করা চলে না, সুতরাং রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় অধ্যাপক ফ্লোরি আমেরিকা যাত্রা করলেন।

আমেরিকায় এই বিষয়ে কাজ হচ্ছিল ইলিনয়র নর্দার্ন রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে। পেনিসিলিয়াম জাতীয় ছত্রক থেকে বিশুদ্ধ পেনি-সিলিন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করাই এখন বিজ্ঞানীমহলের প্রধান সমস্যা। পেনিসিলিন অত্যন্ত অস্থায়ী হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণের ছত্রক-সৃষ্টিকারী তরল পোষণমাধ্যম থেকে অতি সামান্য পেনিসিলিন উদ্ধার করা যায়, ফলে এই বস্তুটির উৎপাদনমূল্য যা পড়ে তা বিবেচনা করে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে পেনিসিলিন ব্যবহারের কল্পনাও তখন এক অবাস্তব চিন্তা ছিল। পেনিসিলিন-উৎপাদনের গবেষণায় সর্বপ্রথম নতুন আলোকপাত করলেন নর্দার্ন রিজিওনাল ল্যাবরেটরীর ডা. ময়ের। তিনি আবিষ্কার করলেন ছত্রক বৃদ্ধি করার জন্য সংরক্ষিত পোষণমাধ্যমের মধ্যে যদি শস্যসিক্ত তরল পদার্থ মেশানো হয় তা হলে ছত্রকের সৃষ্টি অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করে। এই আবিষ্কারের ফলে একই পরিমাণ ছত্রক পোষণমাধ্যম থেকে পেনিসিলিন-উৎপাদন প্রায় শতগুণ বর্ধিত হল। এই সঙ্গেই পেনিসিলিনের বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী ক্ষমতার অনুসন্ধান ও নানাক্ষেত্রে ঠিক কতখানি ঔষধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে গবেষণা চলেছিল। গবেষণায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন বোস্টনের ইভান্স মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডা. চেস্টার কিফার।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার হঠাৎ, কিন্তু স্ট্রেপটোমাইসিনের উদ্ভব হয়েছিল বহু বৎসরের কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে। রাটজারস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী

ওয়াক্‌স্‌ম্যানের সহকর্মী উড্রফ পর্যবেক্ষণ করেন যে, অ্যাকটিনোমাইসিটস্ জাতীয় জীবাণু থেকে নিঃসৃত অ্যান্টিবায়োটিক রোগজীবাণু দমনকল্পে খুবই কার্যকর। ১৯৪১ সালে মানবদেহে পেনিসিলিন ব্যবহারের সাফল্যের কথা ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা অ্যাকটিনোমাইসিটস্ জাতীয় কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক পৃথক করে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করেছেন। যথেষ্ট জীবাণুবিনাশ-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানবদেহের পক্ষে এই বস্তুগুলি ক্ষতিকারক হওয়ার জন্য এই বিজ্ঞানীদলের গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। মানবদেহে পেনিসিলিন-প্রয়োগের সাফল্যের কথা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তাঁরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। পেনিসিলিন সাধারণভাবে গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর কার্যকর তাই গ্রাম-নিগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার বিনাশে সমর্থ অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধানে বিজ্ঞানীমহল মনোযোগ দিলেন। বহু প্রচেষ্টার পর ১৯৪২ সালে ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা অ্যাকটিনোমাইসিস্ ল্যাভেনডুলির পোষণমাধ্যম থেকে একটি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করলেন— তার নাম হল স্ট্রেপটোথ্রিসিন। বস্তুটি বহু রোগজীবাণু ধ্বংস করে, কিন্তু প্রাণীদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। যাই হোক, পরের বছর আর একটি আবিষ্কার তাঁদের দীর্ঘ ব্যর্থ গবেষকজীবনের সমস্ত ক্ষোভকে মিটিয়ে দিল। স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামক একটি অ্যাকটিনোমাইসিটস্ থেকে আবিষ্কৃত হল স্ট্রেপটোমাইসিন। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াক্‌স্‌ম্যান এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। স্ট্রেপটোমাইসিনের রাসায়নিক গুণাগুণ ও জীবাণু-নাশক ক্ষমতা অনেকটা স্ট্রেপটোথ্রিসিনের অনুরূপ, উপরন্তু এ মানবদেহে ব্যবহারের উপযোগী। স্ট্রেপটোমাইসিন বহু প্রকার প্যাথোজিনিক ব্যাকটিরিয়া এমনকি যক্ষ্মার জীবাণুও ধ্বংস করতে পারে। পেনিসিলিন যক্ষ্মার বীজাণু বিনাশ করতে পারে না।

নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিকের সন্ধানে এবার বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানও সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। লিলি, ফিজার, আমেরিকান সায়নামাইড প্রভৃতি কোম্পানীর গবেষণাগারের বিজ্ঞানীবৃন্দও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন নতুন কোনো অ্যাণ্টিবায়োটিক আবিষ্কার করতে। ১৯৪৮ সালে সায়নামাইড কোম্পানীর লেডারলে ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা অ্যাকটিনোমাইসিটিস জাতীয় আর একটি নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিকের আবির্ভাব ঘটালেন। পোষণমাধ্যমের মধ্যে বৃদ্ধির সময় এই অ্যাকটিনোমাইসিট্‌সের সোনালী হলুদ রং এবং নিঃসৃত অ্যাণ্টিবায়োটিকের উজ্জ্বল সোনালী রং দেখে তাদের নাম দেওয়া হল যথাক্রমে স্ট্রেপটোমাইসিস অরিওফেসিয়েনস্‌ ও অরিওমাইসিন। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিকটি কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী। মানবদেহে এর অপকারিতা বেশি নয় এবং এই বস্তুটি কেবলমাত্র মুখগহ্বর দিয়ে গ্রহণ করলেই বহুপ্রকার গ্রাম-পজিটিভ এবং গ্রাম-নিগেটিভ জীবাণুর আক্রমণ রোধ করা যায়। কয়েকটি ভাইরাল সংক্রমণেও অরিওমাইসিনের ব্যবহার খুব সুফলদায়ক।

আমেরিকায় পার্কডেভিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর একদল বিজ্ঞানী ১৯৪৭ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে একটি নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিক আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। ভেনেজুয়েলার মাটি থেকে প্রাপ্ত একটি বিশেষ ধরনের অ্যাকটিনোমাইসিট্‌স্‌ থেকে এই নতুন অ্যাণ্টি-বায়োটিকটি পাওয়া যায়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীও আর-বানার একটি কৃষিপ্রতিষ্ঠানের চাষভূমি থেকেও ঐ একই অ্যাকটিনোমাইসিট্‌স্‌ পৃথক করেন। যাই হোক, ঐ অ্যাণ্টিবায়োটিক বিশুদ্ধভাবে পৃথক করে বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা এর আণবিক কাঠামোর পরিচয়ও লাভ করলেন। বস্তুটির নাম হল ক্লোর‍্যামফেনিকল। পার্কডেভিস কোম্পানী ক্লোরোমাইসেটিন নাম দিয়ে এই বস্তুটিকে বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করলেন। ক্লোরোমাইসেটিন

মুখ দিয়ে গ্রহণ করে বহুপ্রকার গ্রাম-নিগেটিভ ও-পজিটিভ জীবাণুর এবং তৎসঙ্গে রিকেট ও কয়েকটি ভাইরাসের আক্রমণ অতি সহজেই রোধ করা যায়।

ক্লোরোমাইসেটিনের আণবিক কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সংশ্লেষণের দ্বারা এই বস্তুটি প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। প্রধান প্রধান অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের মধ্যে ক্লোরোমাইসেটিনই সর্বপ্রথম শিল্পক্ষেত্রে সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী ফিনলে এবং সহকর্মীরা টেরামাইসিন নামক আর একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পেলেন। বস্তুটি স্ট্রেপটোমাইসিস্ রিমোসাস নামক একটি অ্যাকটিনোমাইসিটিস্ থেকে বিশেষ দ্রবণ দ্বারা পৃথক করে নিয়ে ক্রোমাটগ্রাফি পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়।

স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানী ওয়াক্‌স্‌ম্যান রাটজারস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া যা স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রয়োগকেও তুচ্ছ করতে পারে, তাদের বিনাশের জন্য নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারই এই উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গবেষণার ফল হিসাবে আবিষ্কৃত হল নিওমাইসিন। ঠিক স্ট্রেপটোমাইসিনের পদ্ধতিতেই এই নতুন পদার্থকে পৃথক করা হল। বিশুদ্ধ করার সময় বিজ্ঞানীরা দেখলেন নিওমাইসিনে একটির বেশি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান। যাই হোক, ঐ বস্তুটি থেকে বিশুদ্ধ 'নিওমাইসিন-এ' পৃথক করা হল। জন্তুদের দেহে এই পদার্থের কোনো ক্ষতিকারক ক্রিয়া নেই এবং 'নিওমাইসিন-এ' বহুপ্রকার মাইক্রোব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম।

সম্প্রতি দুজন আমেরিকান মহিলা ডাক্তার নিসটাটিন নামক একটি অ্যান্টি-ফাঙ্গাস অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে ১৯৫৬ সালের পাঁচ হাজার ডলার মূল্যের স্কুইব পুরস্কার লাভ করেছেন। নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্যবিভাগের গবেষণাগারের সঙ্গে সংযুক্ত নিসটাটিনের আবিষ্কর্ত্রীদ্বয় ডা. এলিজাবেথ হাজান

এবং ডা. রচেল ব্রাউন জানিয়েছেন যে, মানবদেহে নিসটাটিনের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিরাপদ। এতদিন অ্যান্টি-ফাঙ্গাস যে সব অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ আবিষ্কার করেছিল জীবদেহে তাদের ব্যবহার নিরাপদ না হওয়ার জন্য ওষধিমূল্যের কোনো সার্থকতাই ছিল না, সুতরাং নিসটাটিনের আবিষ্কার অ্যান্টিবায়োটিক-জগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আরও অনেক অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ আবিষ্কার করেছে, তাদের সকলের পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্রপরিসরে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বহু অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের পর জীবাণুধ্বংসকারী অসাধারণ কার্যক্ষমতা দেখে আবিষ্কর্তা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিশ্বের দরবারে সেই নবাগত ঔষধের মহিমাকীর্তন করেছেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জীবদেহে ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে সে তার আবিষ্কর্তাকে অকূলে ভাসিয়েছে। অজস্র সংখ্যক অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে জীবদেহে নিরাপদ ক্রিয়াকলাপের পরীক্ষায় খুবই অল্প কয়েকটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে আর কয়েকটি প্রধান অ্যান্টিবায়োটিকের নাম উল্লেখ করছি। তারা যথাক্রমে, ডাইহাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন, টাইরোথ্রিসিন, টাইরোসিডিনস্, গ্রামিসিডিন, সাবটিলিন, নিসিন, পলিমিক্সিনস ও ভিওমাইসিন।

উৎস ও উৎপাদন

প্রধান প্রধান অ্যান্টিবায়োটিক যা মানুষের রোগমুক্তির কাজে লাগে, আমরা তা সাধারণত জীবাণু অথবা অণু-উদ্ভিদ থেকে পাই। অ্যান্টিবায়োটিক বহু স্থানে সৃষ্টি হয় এবং এর উৎপাদনের পরিধি কোনো সময়ই কেবলমাত্র জীবাণুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ছত্রক, ব্যাকটিরিয়া, অ্যাকটিনোমাইসিট্স্ প্রভৃতি ছাড়াও বহুপ্রকার উদ্ভিদেও অ্যান্টিবায়োটিক সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ক্লোরেলিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন

হয় ক্লোরেলা থেকে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী বার্ক হোল্ডার ও তাঁর সহকর্মীরা বৃক্ষ ও পর্বতগাত্রে জাত শৈবালেও অ্যান্টিবায়োটিকের সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করেছেন। মদ গাঁজিয়ে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় ইস্টের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিকের অবস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যাঙের ছাতা এবং নানাপ্রকার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন বিষয়েও অনেকেই গবেষণা করেছেন। জীবদেহের রোগনিরাময়কারী প্রধান অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ আমরা জীবাণু ও অণু-উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন করি।

১৯২৯ সালে পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়েছিল, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল। ১৯৪০ সালের ১৪ই নভেম্বর বিজ্ঞানীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং মন্তব্য করেছিলেন, "ছত্রক থেকে পেনিসিলিন স্বতন্ত্র করা মোটেই অর্থকরী নয়। সালফানিলামাইড প্রভৃতির ন্যায় এই অ্যান্টিবায়োটিকও যেদিন সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে, কেবলমাত্র সেইদিনই বস্তুটি অল্পমূল্যে সরবরাহ করা যাবে।" যদিও পেনিসিলিন সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে তবু শিল্পক্ষেত্রে আজও এই বস্তুটি ছত্রক থেকেই পৃথক করা হয়।

বিজ্ঞানী ফ্লোরি, চেইন, হিটলে প্রভৃতি গবেষকবৃন্দ যখন জৈব দ্রবণের সহায়তায় পেনিসিলিন পৃথক করে মানবদেহে এর অলৌকিক নিরাময়কারী কার্যক্ষমতার সন্ধান লাভ করলেন, তখন থেকেই বিজ্ঞানীমহল শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদনে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ফ্লোরি গেলেন আমেরিকায় গবেষণা করতে, এই সঙ্গে আমেরিকা এবং গ্রেটবৃটেনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহও এই প্রচেষ্টায় সমবেতভাবে যোগদান করলেন। আবিষ্কর্তার ভবিষ্যৎবাণীকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৪৩ সালের আগেই শিল্পক্ষেত্রে ছত্রক থেকে পেনিসিলিন পৃথক করবার কারখানা স্থাপিত হল।

পেনিসিলিন-উৎপাদনের প্রথম এবং প্রধান ধাপ, পোষণমাধ্যমে ছত্রকটির বৃদ্ধি সাধন করা। পরে উপযুক্ত সময়ে পোষণমাধ্যম থেকে তার তরল অংশটি নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়। এই তরল অংশেই অবস্থান করে পেনিসিলিন, যাকে জৈব দ্রবণের সহায়তায় পৃথক করা হয়।

প্রায় ১০,০০০ গ্যালনের অথবা তারও বেশি বিরাট বিরাট জীবাণুশূন্য পাত্রে, একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে পেনিসিলিন নিঃসরণকারী ছত্রকটি পোষণমাধ্যমের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে এবং তার মধ্যে দিয়ে পাঠান হয় জীবাণুশূন্য বাতাস। পরিবেশ সর্বদাই জীবাণুশূন্য থাকতে হবে; যে নির্দিষ্ট পরিবেশে পেনিসিলিন উৎপাদনকারী ছত্রক সত্বর বৃদ্ধি লাভ করে সেখানে আরও বহুপ্রকার জীবাণুর সৃষ্টি সহজেই ঘটতে পারে; তাই যে-কোনো জীবাণুর সংক্রমণ থেকে পোষণমাধ্যমকে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। পেনিসিলিয়াম্ নোটেটামই প্রথম ছত্রক যার থেকে বিজ্ঞানী ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই বস্তুটি পোষণমাধ্যমের মধ্যে ভালোভাবে বৃদ্ধিলাভ করে না বলে এর পরিবর্তে শিল্পক্ষেত্রে পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম ব্যবহার করা হয়। বহু গবেষণার পর পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পেনিসিলিন উৎপাদন-কল্পে এই ছত্রকটিই সর্বাপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। পরবর্তী অধ্যায় হল পোষণমাধ্যমটিকে নিংড়ে তার তরল পদার্থটি পৃথক করে নেওয়া। পূর্বে এই তরল পদার্থে সক্রিয় কার্বন যোগ করা হত। কার্বন পেনিসিলিনকে শুষে নিত এবং পরে নিম্ন উত্তাপে অ্যাসিটোনের দ্বারা ঐ কার্বন থেকে তাকে মুক্ত করা হত। কিন্তু বর্তমানে ঐ তরল পদার্থে ফসফরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করে অ্যামাইল অ্যাসিটেটের দ্বারা সোজাসুজি পেনিসিলিন টেনে নেওয়া হয়। অ্যামাইল অ্যাসিটেট থেকে পেনিসিলিনকে আবার পৃথক করা হয় পাতলা সোডিয়াম বাইকার্বনেট সলিউ-শনের দ্বারা। জলে সোডিয়াম পেনিসিলিনের একটি সলিউশন পাওয়া যায় এবং এর থেকেই শুষ্ক করে প্রস্তুত করা হয় পেনিসিলিনের সোডিয়াম সল্ট।

জলের মধ্যে পেনিসিলিনের স্থায়িত্ব কম; বিশেষ করে উত্তাপ যদি বেশি হয় তা হলে খুব তাড়াতাড়ি বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায়, তাই সত্বর বস্তুটি শুষ্ক করে নেওয়া প্রয়োজন। আগে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল ঠাণ্ডায় শুষ্ক করে নেওয়া; অত্যন্ত কম উত্তাপে তরল পদার্থটি যেত জমে, এবং নিম্নচাপে জল তাড়িয়ে দেওয়া হত। তরল পদার্থটিকে শুষ্ক করার পূর্বে অন্যান্য পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে জীবাণুশূন্য করার জন্য আরটেল শ্রেণীর অ্যাসবেসটসের মধ্যে দিয়ে চালানো হত। তার পর ঐ তরল পদার্থে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে পেনিসিলিনের অবস্থিতি পরিমাপ করে, নির্দিষ্ট পরিমাণ পেনিসিলিনের জন্য যে আয়তনের তরল পদার্থের প্রয়োজন তা ছোট ছোট কাঁচের আধারে ভরে একেবারে জমাট ঠাণ্ডায় জল ও বাতাস শূন্য করা হত। সুতরাং ছোট ছোট কাঁচের আধারের মধ্যে প্রয়োজনীয় পেনিসিলিন রক্ষিত হত— পৃথক করে আর ভরবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সোজাসুজি পেনিসিলিনের ক্রস্টাল সৃষ্টি করার জন্য সাধারণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে একটি জৈব দ্রবণের মধ্যে অপরিশোধিত পেনিসিলিন নিয়ে তাতে একটি দ্বিতীয় দ্রবণ মেশানোর ফলে মিশ্র দ্রবণে অবাঞ্ছিত বস্তুগুলি গলে থাকে কিন্তু পেনিসিলিন দ্রবণ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পেনিসিলিনকে একটি জৈব পদার্থের সংযোগে জলে অদ্রবণীয় করে পৃথক করা হয়। পরে পটাসিয়াম অথবা সোডিয়ামঘটিত পদার্থের সহায়তায় ঐ পেনিসিলিন সংযুক্ত জৈব পদার্থকে সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম সেনিসিলিনে পরিবর্তিত করাই পর্যায়ের শেষ ধাপ। নিখুঁতভাবে ওজন করে, জীবাণুশূন্য পরিবেশে ছোট ছোট কাঁচের আধারে পুরে পেনিসিলিন সল্টকে এইবার বিক্রয়ার্থ দোকানে পাঠানো হয়।

অতি সাধারণভাবে পেনিসিলিন উৎপাদনের মূল প্রণালী বর্ণনা করলাম। ব্যবসা-ক্ষেত্রে গোপনতা রক্ষার জন্য উৎপাদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠানই তাদের

প্রস্তুত-প্রণালীর মূল বিষয়বস্তু কোনোদিনই প্রকাশ করেন না। স্ট্রেপটো-মাইসিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন বিষয়েও ঠিক এই একই গোপনতা রক্ষা করা হয়। যাই হোক স্ট্রেপটোমাইসিনের উৎপাদন প্রণালীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমে জারণ, তৎপরে পৃথককরণ এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধিকরণ।

স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াসএর বীজ বাতাসের উপস্থিতিতে বৃদ্ধিলাভ করে এবং পরে তার জারণ-ক্রিয়ার দ্বারাই পোষণমাধ্যমে স্ট্রেপটোমাইসিন সঞ্চারিত হয়। জীবাণুশূন্য পাত্রে প্রথমে স্ট্রেপটোমাইসিন গ্রিসিয়াসের বীজ বপন করে তাকে বর্ধিত করা হয়, তার পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই বস্তুটি একটি বিশেষ মাধ্যমের মধ্যে প্রয়োজনমত একদিন থেকে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত জারণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থান করে। আবিষ্কারের সময় স্ট্রেপটোমাইসিন পৃথক করার জন্য বিজ্ঞানী ওয়াক্স্‌ম্যান যে পোষণমাধ্যমের সাহায্য নিয়েছিলেন তাতে শতকরা একভাগ গ্লুকোজ, আধভাগ পেপটোন, আধভাগ লবণ এবং সামান্য একটু মাংসের রস ছিল। জারণের জন্য বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে প্রায় একই পোষণ-মাধ্যম সামান্য কিছু অদলবদল করে ব্যবহার করা হয়। পোষণমাধ্যমের মূল্য কমাবার জন্য গ্লুকোজের বদলে স্টার্চ, পেপটোনের বদলে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করে সমান ফলাফল পাওয়া গেছে। মাংসের রসের বদলে শস্যসিক্ত জলও ব্যবহার করা চলে। অপ্রয়োজনীয় জীবাণুশূন্য পরিবেশে, সহন-শীল উত্তাপে, অতিবিশুদ্ধ বাতাসের সহায়তায় জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

পোষণমাধ্যমের তরল পদার্থ থেকে পেনিসিলিনের ন্যায়, জৈব দ্রবণের সাহায্যে স্ট্রেপটোমাইসিন পৃথক করা চলে না। এই ক্ষারধর্মী পদার্থটি অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই পরিশোধিত কার্বনের দ্বারা একে শোষণ করে পৃথক করা হয়। পোষণমাধ্যমের তরল পদার্থটিতে সর্বপ্রথম সালফিউরিক অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহযোগে অম্লধর্মী করে শতকরা মাত্র আধ-

ভাগ কার্বনের সহায়তায় পরিশোধিত করা হয়। অম্লধর্মী অবস্থায় স্ট্রেপটোমাইসিন কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী ; এই স্থায়িত্বের সুযোগ নিয়ে সামান্য পরিমাণের ঐ কার্বন, বস্তুটি থেকে বহুপ্রকার ময়লা এবং রং শোষণ করে তরল পদার্থটিকে পরিশোধিত করে। এই অম্লধর্মী অবস্থায় কার্বন স্ট্রেপটোমাইসিনকে শোষণ করতে পারে না। স্ট্রেপটোমাইসিন পৃথক করার পরবর্তী অধ্যায় হল একে সমধর্মী করা। ক্ষার অথবা অম্ল, কোনোটির আধিক্যই চলবে না, সুতরাং এবার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সহায়তায় রঙ-হীন বিশুদ্ধ তরল পদার্থটিকে অত্যন্ত সতর্কভাবে সমধর্মী করা হয়। হিসাবমত আবার কার্বন মেশানো হয়, কার্বন তরল মাধ্যমটি থেকে স্ট্রেপটোমাইসিন শোষণ করে নিয়ে নিজ দেহে গ্রহণ করে।

কার্বনকে পৃথক করে নিয়ে জল ও অ্যালকোহল দিয়ে বারে বারে ধোয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় ময়লা তাদের সঙ্গে চলে যায় আর কার্বনের মধ্যে পড়ে থাকে স্ট্রেপটোমাইসিন। অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রেপটোমাইসিনকে কার্বন থেকে পৃথক করে নিয়ে অ্যালকালী দিয়ে সমধর্মী করে নিম্নচাপে ঘন করলেই তরল পদার্থটি থেকে অপরিশোধিত স্ট্রেপটোমাইসিন নিক্ষিপ্ত হয়। অপরিশোধিত স্ট্রেপটোমাইসিনে নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলে মানবদেহে প্রয়োগের পূর্বে এই অ্যান্টিবায়োটিকটি অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা দরকার। ক্রোমাটোগ্রাফী প্রক্রিয়ার সাহায্যে, অথবা যুগ্ম পদার্থ হিসাবে এই অ্যান্টি-বায়োটিকটিকে পরিশুদ্ধ করা হয়। স্ট্রেপটোমাইসিনকে নানাপ্রকার জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটোনের সাহায্যে অদ্রবণীয় পদার্থ হিসাবে দ্রবণ থেকে নিক্ষেপ করে, প্রয়োজনীয় অজৈব অ্যাসিডের সঙ্গে প্রক্রিয়া ঘটিয়ে পাওয়া যায় মোটামুটি বিশুদ্ধ স্ট্রেপটোমাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড অথবা হাইড্রোব্রোমাইড। হাইড্রোক্লোরাইড অথবা হাই-ড্রোব্রোমাইডকে মিথানল দ্রবণের মধ্যে নিয়ে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, অথবা

সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে মিশ্রিত করে স্ট্রেপটোমাইসিনের বিশুদ্ধ অজৈব যুগ্ম যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। পুনরায় এই পদার্থ অতি বিশুদ্ধ স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট অথবা হাইড্রোক্লোরাইড প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা চলে। এইবার কেবল বাকি থাকে সতর্কভাবে কাঁচের আধারে স্ট্রেপটোমাইসিন ভরা এবং প্যাক করে দোকানে পাঠানো।

অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রণালী বিষয়ে খুব কম কথাই জানা আছে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যবসায়ের নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত-প্রণালী গোপন করে রেখেছেন। তাদের প্রকৃতি এবং গুণাগুণ দেখে মনে হয় উৎপাদন-প্রণালীর সাধারণ পর্যায়-সকল মোটামুটি একই ধরনের। কেবল বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের নিজস্ব বিশেষ গুণাগুণ অনুসারে প্রয়োজনমত পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। অরিওমাইসিন-উৎপাদনেরও প্রথম প্রক্রিয়া হল জারণ। স্ট্রেপটোমাইসিন অরিওফেসিয়েনস্-এর বীজ, স্টার্চ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম পদার্থসমূহ, শস্যসিক্ত তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি মিশ্রিত পোষণমাধ্যমের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে এবং পরে বাতাসের সাহায্যে জারণক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় অরিওমাইসিন। বস্তুটিকে অ্যামোনিয়াম সালফেটের উপস্থিতিতে অ্যামাইল অ্যাসিটেট অথবা বুট্যাইল অ্যালকোহলের দ্বারা পোষণমাধ্যমের তরল অংশ থেকে টেনে নেওয়া হয়। এর পর ঐ জৈবদ্রবণ থেকে কার্বন অথবা অ্যালুমিনা, অরিওমাইসিন শোষণ করে পৃথক করে রাখে। ক্ষতিকারক বিভিন্ন পদার্থসমূহকে বিতাড়িত করবার জন্য অরিওমাইসিন-সমন্বিত কার্বনকে বারে বারে জল এবং অ্যাসিটোন দ্বারা ধোয়ার পরে অম্লধর্মী অ্যালকোহলের সাহায্যে অ্যান্টিবায়োটিকটি বার করে নেওয়া হয়। মিশ্রণটি নিম্নচাপে শুষ্ক করে নিয়ে বুট্যাইল অ্যালকোহল দ্বারা দ্রবীভূত করলে অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থগুলি দ্রবণের মধ্যে যায় না;

মোটামুটি বিশুদ্ধ অরিওমাইসিন-সমন্বিত বুট্যাইল অ্যালকোহলটি নিম্নচাপে ঘন করে নিয়ে জলশূন্য ঈথার মিশ্রিত করলে বিশুদ্ধ অরিওমাইসিন অদ্রবণীয় হয়ে তরল মাধ্যম থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। সামান্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যুক্ত জলে অরিওমাইসিন দ্রবীভূত করে, অত্যন্ত নিম্ন উত্তাপে ও চাপে জমাট অবস্থায় শুষ্ক করলে পাওয়া যায় অরিওমাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড।

অ্যাণ্টিবায়োটিকসমূহের উৎপাদন-প্রণালী মোটামুটি বর্ণনা করা হল, এবার জানতে হবে তাদের মাত্রার পরিমাপ কি। অতি পরিশোধিত সোডিয়াম পেনিসিলিনের এক মিলিগ্রাম বর্তমানে ১৬৬৭ আন্তর্জাতিক মাত্রার সমান। বিশুদ্ধ স্ট্রেপটোমাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং সালফেটের এক মিলিগ্রাম যথাক্রমে ৮৪২ এবং ৭৯৮ আন্তর্জাতিক মাত্রার সমান।

অ্যাণ্টিবায়োটিকসমূহ উৎপাদনের পরে পরিবেশন করা আর একটি কঠিন কাজ। ওজন করে কাঁচের আধারে ভরবার এবং ঐ আধারটির মুখ উত্তাপের সাহায্যে একেবারে বন্ধ করে দেবার সময় যাতে অন্য কোনো ক্ষতিকারক জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পরিবেশনের এই কাজ তাই সম্পূর্ণ জীবাণুশূন্য কক্ষে, জীবাণুশূন্য পোশাকে ও পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়। কক্ষের মধ্যে বাতাস পর্যন্ত ফ্যানের সাহায্যে জীবাণুশোধক তুলোর স্তরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে, আর উচ্চচাপে ঘরের বাতাস আর একটি বিশেষ নির্গমন পথ দিয়ে বার হয়ে যায়। ঔষধ পরিবেশনের সময় কোনো কারণে উত্তাপের প্রয়োজন হতে পারে তাই সংযুক্ত একটি অলিন্দে গরম করবার সমস্ত আয়োজন থাকে।

রোগনিরাময়ে অ্যাণ্টিবায়োটিক

রোগনিরাময়ের জন্য মানবদেহে ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় অ্যাণ্টি-বায়োটিকের নির্বাচনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই প্রসঙ্গে কোন্ অ্যাণ্টি-

বায়োটিকটি সহজপ্রাপ্য সেকথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। একই রোগে যদি পেনিসিলিন এবং অরিওমাইসিন উভয় ঔষধই কার্যকর হয় তা হলে প্রাপ্তির প্রাচুর্য এবং তৎসঙ্গে অল্পমূল্যের কথা বিবেচনা করে চিকিৎসকেরা সকল ক্ষেত্রেই পেনিসিলিন ব্যবহারের নির্দেশ দেবেন। যে রোগে পেনিসিলিন কার্যকর নয়,— অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার তাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।

রোগজীবাণুকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তাদের উপর কৃত্রিম রং প্রয়োগ করা হয়। জীবাণু-বিজ্ঞানী গ্রাম পরীক্ষা করে দেখেন যে, জীবাণু এবং অণু-উদ্ভিদের উপর জেনসিয়ান ভায়োলেট প্রয়োগ করলে কিছু জীবাণু এই বেগুনি রং গ্রহণ করে এবং কিছু করে না। তিনি এই তথ্য এবং নানা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে জীবাণু সকলকে মোটামুটি প্রধান দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যারা বেগুনি রং গ্রহণ করে তারা গ্রাম-পজিটিভ এবং যারা করে না তারা গ্রাম-নিগেটিভ। প্রধানত দেখা গিয়েছে পেনিসিলিন স্ট্রেপটোককাস, নিউমোককাস, গনোককাস, মেনিনজোককাস প্রভৃতি গ্রাম-পজিটিভ জীবাণুর উপরেই বিশেষ ক্রিয়াশীল। গ্রাম-নিগেটিভ জীবাণুর উপর এর কোনো ক্রিয়া নেই বললেই চলে তাই এদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়। মোটামুটি দেখতে গেলে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর উপর অরিওমাইসিনের কার্যকারিতা খুবই বেশি। প্রায় সবরকম গ্রাম-পজিটিভ জীবাণুর উপরই এর ক্রিয়া আছে এবং জীবাণু প্রতিরোধক্ষমতা পেনিসিলিনের চেয়ে কম নয়। এ ছাড়াও নানা প্রকার ভাইরাস এবং পেনিসিলিনের ক্ষমতা অগ্রাহ্যকারী বহু-প্রকার গ্রাম-নিগেটিভ জীবাণুর উপরও অরিওমাইসিনের ব্যবহার সুফল দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচনের পরবর্তী অধ্যায় হল ঔষধের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিরূপণ করা। পেনিসিলিন সাধারণত রক্তবহনকারী নালী অথবা পেশীর

মধ্যে স্থচির দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য প্রাণীদেহের রক্তের মধ্যে একটি বিশেষ পরিমাণের পেনিসিলিনের অবস্থিতির প্রয়োজন হয়। সোজা স্থচির দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে রক্তের মধ্যে পেনিসিলিনের নির্দিষ্ট পরিমাণ অবস্থিতি রক্ষা করা সম্ভব। পেনিসিলিন অধিক তাপ, অম্ল এবং কয়েকশ্রেণীর রোগ জীবাণুর ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় বলে মুখগহ্বর দিয়ে একে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। মলম, স্প্রে ইত্যাদি নানা ভাবেও পেনিসিলিন সোজাস্থজি রোগাক্রান্ত স্থানে লাগান চলে। স্ট্রেপটোমাইসিনও স্থচির দ্বারা দেহমধ্যে সোজাস্থজি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং চিকিৎসকেরা সাধারণত পেশীর মধ্যে একে প্রয়োগ করাই পছন্দ করেন। মুখ গহ্বর দিয়ে গ্রহণ করলে পেনিসিলিনের ন্যায় স্ট্রেপটোমাইসিনও অন্ত্রে সহজে শোষিত হয় না। তবে অন্ত্রের বিভিন্ন জীবাণুর উপর স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রভাব খুবই বেশি অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন এবং ক্লোরোমাইসেটিন স্থচিদ্বারা দেহমধ্যে প্রয়োগ অল্প ক্ষেত্রেই হয়। অন্ত্রসমূহ অতিসহজেই এদের শুষে নিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে বলে মুখগহ্বর দিয়ে গ্রহণ করাই বিধেয়। মলম হিসাবে ক্লোরো-মাইসেটিনের ব্যবহার যথেষ্ট বেশি, অরিওমাইসিন ও টেরামাইসিন সংযুক্ত-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এর পর আসে অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের রোগনিরাময়ের প্রয়োগ-মাত্রা নির্ণয়। প্রস্রাব ও পিত্তের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ প্রাণীদেহ থেকে নির্গত হয় বলে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এদের প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণকল্পে সর্বপ্রথম দুটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার; প্রতি ২৪ ঘণ্টায় কতখানি অ্যান্টিবায়োটিক রোগীকে দিতে হবে এবং রোগের আক্রমণ রোধ-কল্পে আনুমানিক মোট কি পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ নির্ণয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এই হিসাবের মাধ্যমেই রক্তের মধ্যে রোগজীবাণু-বিনাশকারী অ্যান্টি-

বায়োটিকের প্রয়োজনীয় অবস্থিতি সর্বদাই নির্দিষ্ট রাখতে হবে। সাধারণক্ষেত্রে পেনিসিলিনের বেলায় চিকিৎসকেরা দিনে ৫-৬ লাখ আন্তর্জাতিক মাত্রা ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রয়োজনবোধে কোনো বিশেষ জীবাণুনাশের জন্য রক্তের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবস্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে আরও বেশি ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট হিসাব নেই, প্রয়োজনের পরিমাণ চিকিৎসকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করেন। রোগনিরাময়ের সম্পূর্ণ মাত্রা স্থির করার আগে আরও কয়েকটি কারণাকারণ নির্ধারণ করতে হবে। রোগমুক্তির পরে যাতে ঔষধ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রোগের পুনরাক্রমণ না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। টাইফয়েড্ রোগ-মুক্তির পর, পুনরাক্রমণের ভয়ে চিকিৎসকেরা আরও কয়েকদিন ক্লোরো-মাইসেটিন ব্যবহারের নির্দেশ দেন। অ্যাকটিনোমাইকোসিস রোগের লক্ষণ মিলিয়ে গেলেও এর পুনরাক্রমণ রোধের জন্য কয়েকমাস অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। আবার আর একটি বিপদাশঙ্কাও আছে, বেশি অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহার করার জন্য দেহমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মত কেউই প্রকাশ করতে পারেন না। অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক ক্ষমতার সৃষ্টি না করে রোগনিরাময় এবং তার পুনরাক্রমণ বন্ধ করা অনেকাংশে নির্ভর করবে চিকিৎসকের সম্পূর্ণ মাত্রা নিরূপণ করার উপর।

অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে যুগ্মভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যায়, তাই রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো ঔষধ যুগ্মভাবে প্রয়োগ করা চলে কিনা তা বিচার করাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিউমোনিয়ায় পেনিসিলিনের সঙ্গে সালফা-ডায়াজিন এবং যক্ষ্মা রোগে স্ট্রেপটোমাইসিনের সঙ্গে প্যারা-অ্যামিনো-স্যালিস্যালিক অ্যাসিড ব্যবহার করে কেবল

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশি সুফল পাওয়া গেছে। যক্ষ্মার চিকিৎসায় প্যারা-অ্যামিনো-স্যালিস্যালিক অ্যাসিড রোগ-নিরাময়কল্পে নিজের ক্ষমতার দ্বারা সহায়তা করে, উপরন্তু যক্ষ্মার জীবাণুর মধ্যে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধক শক্তির উদ্ভব হতে বিলম্ব ঘটায়।

মানবদেহে অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া বিষয়েও কম গবেষণা হয় নি। দেখা গিয়েছে এদের সকলের মধ্যে পেনিসিলিনের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা নির্দোষ। জনৈক রোগীকে প্রতিদিন ১০ কোটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেনিসিলিন প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে প্রয়োগ করেও কোনো বিষাক্ত লক্ষণ দেখা যায় নি। স্ট্রেপটোমাইসিন পেনিসিলিনের চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজক কিন্তু অনেক প্রকার ঔষধেরই এর চেয়ে বেশি বিষাক্ত প্রভাব আছে, এবং তাদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় স্ট্রেপটোমাইসিনের ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া এমন কিছু বেশি নয়। অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন এবং টেরামাইসিনের ব্যবহারে অনেক সময়েই অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা যায়। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব অনেকাংশেই রোগীর দেহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তাঁরা কোনো-ক্রমেই এই ঔষধকে বরদাস্ত করতে পারেন না। ঔষধগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দেহে নানাপ্রকার কষ্টকর উপসর্গের সৃষ্টি হয়, ফলে কোনো কঠিন রোগেও প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা চলে না। এ একপ্রকার এলার্জী— এর জন্যেই পৃথকভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন। অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কাজকর্ম করলে এই বস্তুগুলি চর্মের সংস্পর্শে এসে চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

রোগনিরাময়ে বিভিন্নপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্বন্ধে এবার সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক। সাধারণ রোগের মধ্যে টাইফয়েড, টাইফাস জ্বর, প্লেগ প্রভৃতির আক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথেষ্ট সুফলদায়ক। বিউবনিক এবং নিউমনিক এই উভয় প্রকার প্লেগের

চিকিৎসায়ই সালফা-ডায়াজিন-এর সঙ্গে মিশ্রিত করে স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড এবং টাইফাস জ্বরের জন্য ক্লোরোমাইসেটিনের ব্যবহারই ঐসব রোগের জীবাণু বিনাশের নিশ্চিত পন্থা। ব্রুসেলওসিস (Brucellosis) রোগের আক্রমণে ক্লোরোমাইসেটিন এবং অরিওমাইসিনের ব্যবহার যথেষ্ট সুফলদায়ক। সংক্রামক রোগের মধ্যে নাম করতে হয় ডিপথিরিয়া, হুপিংকাশি, হাম আর বসন্তের। আসল অথবা জলবসন্তের চিকিৎসার কারণ নিরাময়কল্পে অ্যাণ্টিবায়োটিক কোনো কাজেই আসে না, কিন্তু হামের চিকিৎসায় পেনিসিলিনের ব্যবহার যথেষ্ট মূল্যবান। ডিপথিরিয়ার চিকিৎসায় পেনিসিলিন একটি প্রধান ঔষধ। অরিওমাইসিন এবং ক্লোরোমাইসেটিন হুপিংকাশির প্রকোপ সারিয়ে দিতে পারে। এই রোগ-নিরাময়কল্পে পেশীর ভিতরেও স্ট্রেপটোমাইসিন সূচির দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। যৌন রোগের মধ্যে সিফিলিসের চিকিৎসায় পেনিসিলিন অসাধারণ কার্যকর। এই রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন ছাড়াও অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ইত্যাদিও সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা চলে। কার্ডিওভাসকুলার সিফিলিস (Cardio-vascular Syphilis), নিউরোসিফিলিস (Neuro-Syphilis) ও অন্যান্য নানাপ্রকার সিফিলিস বহুদিনকার পুরোনো রোগ হলে, অত্যন্ত বেশিমাত্রায় পেনিসিলিনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেশিমাত্রায় অ্যাণ্টিবায়োটিকটি ব্যবহার করার পূর্বে দেহমধ্যে হারক্স-হাইমার (Herx-heimer) প্রক্রিয়ার খারাপ ব্যবহারের কথা চিন্তা করা উচিত। এইজন্য পেনিসিলিন প্রয়োগের পূর্বে ও পরে বিসমাথ ও আর্সেনিক ইনজেকসন দেওয়া হয়। গনোরিয়ার চিকিৎসায় পেনিসিলিনের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর। বিভিন্ন প্রকার যক্ষ্মার চিকিৎসায় প্যারা-অ্যামিনো স্যালিস্যালিক অ্যাসিড এবং আইসো-নিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড-এর সঙ্গে একত্রভাবে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগ করা হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি বুকের রোগনিরাময়ে অরিওমাইসিনের

ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা কার্যকর। কিন্তু পেনিসিলিন সহজপ্রাপ্য বলে এই রোগের সাধারণ চিকিৎসায় পেনিসিলিনই প্রয়োগ করা হয়। রোগের সঙ্গে পেনি-সিলিনের প্রভাব অগ্রাহ্যকারী গ্রাম-নিগেটিভ জীবাণুর সংক্রমণও ঘটে থাকলে, স্ট্রেপটোমাইসিনের ব্যবহার সুফলদায়ক। বিভিন্নপ্রকার ম্যানিনজাইটিসের চিকিৎসায় পেনিসিলিনই প্রধান ঔষধ। সালফা-ডায়াজিনের সঙ্গে যুগ্মভাবে এই অ্যান্টিবায়োটিকটি রোগীর দেহে ব্যবহৃত হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জাল মেনিনজাইটিস রোগে (Influenzal Meningitis) পেনিসিলিনের প্রভাব খুবই কম তাই এইক্ষেত্রে অরিওমাইসিন ব্যবহার করা বিধেয়। স্ট্রেপটোমাইসিন এবং ক্লোরোমাইসেটিনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্যকর।

নানাপ্রকার চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য মলম, স্প্রে, ইনজেকসন ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে পেনিসিলিন ব্যবহৃত হয়। যেসব চর্মরোগের ক্ষেত্রে জীবাণুর সঙ্গে ঔষধের সরাসরি সংযোগ ঘটতে পারে সেখানে রোগাক্রান্ত স্থানীয় অঞ্চলে পেনিসিলিন মলম প্রয়োগ করাই ভাল। কিন্তু কার্বাঙ্কল অথবা ফোঁড়া যার কারণ চর্মের নীচে থাকে, সেইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় অঞ্চলে পেনিসিলিন প্রয়োগ না করে সূচিদ্বারা দেহমধ্যে প্রয়োগ করাই বিধেয়। স্ট্রেপটোমাইসিনও চর্মরোগ নিরাময়কল্পে নানাভাবে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু মলম হিসাবে রোগাক্রান্ত অঞ্চলে এর প্রয়োগের প্রভাব মনে হয় কম।

পায়োরিয়া প্রভৃতি দাঁতের রোগে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই কার্যকর নয়। তবে দাঁত তোলা এবং মাড়ির উপর অস্ত্রোপচারের সময় বাহিরের জীবাণুর আক্রমণ রোধ করার জন্য পেনিসিলিন ব্যবহার করা হয়। ভিনসেন্টস এনজাইনার (Vincent's angina) আক্রমণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশীর মধ্যে পেনিসিলিনের প্রয়োগ অথবা পেনিসিলিন লজেন্সের ব্যবহার, রোগ নিরাময় করে। অস্টিওমাইলিটিস (Osteomyelitis) রোগে অধিক পরিমাণে পেনিসিলিনের ব্যবহার খুব সুফলদায়ক।

নাক, গলা এবং কানের চিকিৎসায় নানাপ্রকার বিষাক্ত লক্ষণযুক্ত গ্রাম নিগেটিভ বীজাণুর আক্রমণে ব্যবহৃত হয় স্ট্রেপটোমাইসিন। পেনিসিলিনের প্রভাব তুচ্ছকারী জীবাণুর আক্রমণ রোধ করার জন্য পছন্দ করা হয় অরিওমাইসিন। প্রথমেই ধরা যাক টনসিলের কথা— সালফোনামাইড ব্যবহারই এই রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সাংঘাতিক অবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কুইনসি (Quinsy) রোগে সর্বদাই পেনিসিলিন ব্যবহার করা উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্বারা যে সব আলাদা উপসর্গের সৃষ্টি হয় তা নানাভাবে পেনিসিলিন প্রয়োগের দ্বারা কমানো যেতে পারে কিন্তু রোগের আসল কারণের নিরাময় ঘটে না।

কানের ঝিল্লিপ্রদাহ, ভিতরের এবং বাইরের নানাপ্রকার বেদনায় পেনিসিলিন ব্যবহারই বিধেয়। মস্তিষ্কের অন্তর্দেশের স্ফোটকে পেনিসিলিনের ব্যবহার অতি সত্বর রোগের উপশম ঘটায়। এই সব রোগের নিরাময়কল্পে ক্লোরোমাইসেটিনের ব্যবহারও অত্যন্ত সুফলদায়ক। ওটাইটিস মিডিয়া রোগের তীব্র আক্রমণে অস্ত্রোপচারের দ্বারা পুঁজ বার করে দেওয়া হয়, অবশ্য রোগের প্রথম অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পেনিসিলিন প্রয়োগের দ্বারাও এর নিরাময় সম্ভব; পেনিসিলিন সাধারণ অবস্থায় সূচির দ্বারা দেহমধ্যে প্রয়োগ করাই বিধেয়। ওটাইটিস মিডিয়ার কারণ গ্রাম-নিগেটিভ বীজাণু হলে, ফোঁটা হিসাবে স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করা হয়। রোগাক্রান্ত স্থানীয় অঞ্চলে ক্লোরোমাইসেটিন (প্রপিলিন গ্লাইকলের সলিউসনে) ব্যবহার করলেও অত্যন্ত সুফল পাওয়া যায়।

চোখের আচ্ছাদনের তলার এবং উপরের নানাপ্রকার রোগে সাধারণক্ষেত্রে পেনিসিলিনের ব্যবহার সুফলদায়ক। আচ্ছাদনের তলার রোগে পেনিসিলিন ইনজেকসন এবং আচ্ছাদনের উপরের রোগে চোখের জলে পেনিসিলিন ড্রপ ধুয়ে যায় বলে পেনিসিলিন মলম ব্যবহার করা হয়, কিন্তু

রোগের কঠিন অবস্থায় ইনজেকসনই ব্যবহার করা উচিত। রোগের কারণ গ্রাম-নিগেটিভ বীজাণু হলে নানাভাবে স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করা চলে। চোখের রোগের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অরিওমাইসিন এবং টেরামাইসিনের ব্যবহার অত্যন্ত সুফলদায়ক হওয়ার জন্য চিকিৎসকেরা এই অ্যান্টিবায়োটিক দুটিই বেশি পছন্দ করেন। ট্রেকোমা, কার্ণিয়ার ক্ষত, নবজাতকের চোখ-ওঠা প্রভৃতি রোগে পেনিসিলিন ব্যবহার করা হয়। চোখের কোনো কোনো রোগে ক্লোরোমাইসেটিনেরও রোগনিরাময়কারী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের মধ্যে টেরামাইসিনের ব্যবহার অত্যন্ত বিস্তৃত। যে সব কঠিন রোগে অন্যান্য সব অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া বিফল হয়— সেখানে বহু ক্ষেত্রেই টেরামাইসিন ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে কিডনীর রোগে টেরামাইসিনের ক্রিয়া খুবই আশাপ্রদ। কৃত্রিম উপায়ে টেরামাইসিন প্রতিরোধক জীবাণু উৎপাদন করে দেখা গিয়েছে, তারা অক্লেশেই অরিওমাইসিন এবং ক্লোরোমাইসেটিনের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পারে।

বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে দেহমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভব হয়, তাই সামান্য কারণে এই জাতীয় ঔষধের প্রয়োগ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে দেহমধ্যে স্টেফাইলকক্কি অরিয়াস এবং স্টেফাইলকক্কি অ্যালবাস প্রভৃতি জীবাণুর সৃষ্টিই পেনিসিলিন প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভবের জন্য দায়ী। ধাপে ধাপে এবং অতি সত্বর দেহমধ্যে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভব হয় বলে, যেখানে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা চলে সেখানে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগ করা হয় না। অরিওমাইসিন প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব আস্তে আস্তে উদ্ভব হয়। ক্লোরোমাইসেটিন এবং টেরামাইসিনের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতার উদ্ভব বিরল। এদের উদ্ভব ধাপে ধাপে এবং সেই ধাপের পরিমাণ স্ট্রেপটোমাইসিনের চেয়ে অনেক কম।

অ্যান্টিবায়োটিকের অন্যান্য ব্যবহার

অ্যান্টিবায়োটিকের অন্যান্য ব্যবহারের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথমে পশু-চিকিৎসায় এর প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে পশু-চিকিৎসায় এর স্থান মানুষের চিকিৎসায় অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহারের ঠিক পরেই আসে। পশুর রোগ-নিবারণকল্পে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা আছে; এর মধ্যে প্রধানতম হলো লাভালাভের বিচার। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে রোগনিরাময় হবে জেনেও অনেক ক্ষেত্রে পশু-চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলে না কারণ ঐ পশুর বিরাট দেহের অনুপাতে রোগ-নিরাময়কল্পে যে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হবে তার মূল্য হয়তো রুগ্ণ পশুর চেয়ে বেশি। ব্যবসায়ী পশুপালক লাভের আশাতেই পশুপালন করেন, তাই দামের চেয়ে বেশি অর্থব্যয় করে রুগ্ণ পশুকে নিরাময় করার দায়িত্ব তিনি নিশ্চয়ই নেবেন না। অবশ্য পোষা কুকুর অথবা বিড়ালের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে মূল্যবোধের চেয়ে ভালবাসার অনুভূতিই মানুষকে পাগল করে তোলে, তাই পোষা কুকুরের চিকিৎসা ও জীবনরক্ষার জন্য ডাক পড়ে খ্যাতনামা চিকিৎসকের, সেবা করার জন্য সর্বদাই নার্স থাকে হাজির। সুতরাং পোষা জন্তুর প্রাণরক্ষার্থে অ্যান্টিবায়োটিকের মূল্য মানুষকে বিচলিত করে না। তা ছাড়া আর একটা দিকও আছে, গোরু-ঘোড়ার বিরাট দেহের তুলনায় কুকুর বা বিড়ালের দেহ অনেক ছোট, তাই চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন কম হওয়ার জন্য খরচও কম হয়।

পশু-চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অন্যতম অসুবিধা হল, পশুদেহের জটিলতা। চিকিৎসকগণকে সব সময়েই বিভিন্ন পশুদেহের নানা-রকমের রোগ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরিমাণ ও প্রণালী বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত থাকতে হবে। পশুদের

হাসপাতালেরও খুব অভাব। তাই সব সময়ে রোগ নির্ধারণ করে দূরের কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই রোগাক্রান্ত পশু বা পাখি মারা যায়। এই সব কারণই অনেক ক্ষেত্রেই পশু-চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানী ডুবস ১৯৩৯ সালে এমন একটি দ্রবণীয় বস্তু আবিষ্কার করলেন যা বিভিন্ন প্রকার 'গ্রাম-পজিটিভ' বীজাণুর বিনাশে খুবই কার্যকর। বাইরে থেকে পেটের মধ্যে ইনজেকসন করে এই বস্তুটির দ্বারা নিউমোকক্কাই এবং স্ট্রেপটোকক্কাই বীজাণুর আক্রমণ রোধ করা সম্ভব। ঐ দ্রবণীয় বস্তুটি থেকে ডুবস গ্রামিসিডিন নামক একটি পদার্থ পৃথক করলেন এবং দেখা গেল, গ্রাম-পজিটিভ বীজাণু বিনাশে এর কার্যকারিতা খুবই বেশি। পরে এই গ্রামিসিডিন থেকেও তুটি পৃথক পদার্থ পাওয়া গেল, একটির নাম গ্রামিসিডিন অক্ষুণ্ণ রেখে অপরটির নাম দেওয়া হল টাইরোসিডিন হাইড্রোক্লোরাইড। কিছু দিনের মধ্যেই ডুবস সাহেব টাইরোথ্রিসিন নামক অ্যালকোহলে দ্রবণীয় আর একটি বস্তু প্রস্তুত করলেন যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম-নিগেটিভ বীজাণুর বিনাশেও যথেষ্ট কার্যকর। টাইরোথ্রিসিনের মধ্যে গ্রামিসিডিন এবং টাইরোসিডিন এই উভয় পদার্থই বর্তমান। যাই হোক টাইরোথ্রিসিন এবং গ্রামিসিডিন ইঁদুরের পক্ষে ক্ষতিকারক ও উত্তেজক হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা মানবদেহে এই পদার্থ ব্যবহার না করে পশু-চিকিৎসায় এর গুণাগুণ বিচার করবার চেষ্টা করলেন। গ্রাম-পজিটিভ বীজাণুর আক্রমণরোধে গ্রামিসিডিনের কার্যকারিতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও, টাইরোথ্রিসিনের মূল্য কম এবং প্রস্তুতি সহজ হওয়ার জন্য পশু-চিকিৎসায় এর ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।

গবাদি পশুর পালানের প্রদাহের নিরাময়ের জন্য যে পরিমাণ গবেষণা ও অর্থব্যয় ব্যবসায়ীরা করেছেন তা কল্পনা করা যায় না। এই রোগ তাদের ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, একে প্রতিরোধ না করতে পারলে পশু

ব্যবসায়ে বিপর্যয় সুনিশ্চিত। স্ট্রেপটোকক্কাস আগলাকটিয়া (Streptococcus aglactiae) একটি গ্রাম-পজিটিভ বীজাণু এবং এই রোগের মূল কারণ। অ্যান্টিবায়োটিক টাইরোথ্রিসিন গ্রাম-পজিটিভ বীজাণু ধ্বংস করে তাই এই ঔষধ পালান প্রদাহ বন্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা হল। আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের পশু-স্বাস্থ্য-বিভাগের গবাদি পশুর পালানের প্রদাহ উপ-সমিতি এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হলেন। গবাদি পশুর দেহের অনুপাতে বিভিন্ন পরিমাণে টাইরোথ্রিসিন প্রয়োগ করে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ রোগ নিরাময় করা সম্ভব, কিন্তু দেখা গেল এই ঔষধ পালানের টিস্যুসমূহের পক্ষে উত্তেজক, এবং পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে উপকারের চেয়ে অপকার হবার সম্ভাবনাই বেশি। বাইরে থেকে মলম হিসাবে টাইরোথ্রিসিন প্রয়োগ করে গবাদি পশুর পালান এবং বাঁটের নানাপ্রকার ক্ষত অতি সত্বর নিরাময় করা যায়।

গবাদিপশুর রোগে টাইরোথ্রিসিনের উপকার এবং অপকার দুই আছে, সেদিক দিয়ে পেনিসিলিন ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি। বীজাণুর আক্রমণ-রোধকল্পে পেনিসিলিনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা জানার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সরবরাহের স্বল্পতার জন্য এই বস্তুটির পশুদেহের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৪৫ সালে মেরিল্যাণ্ডের পশুরোগ চিকিৎসা-কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গবাদিপশুর পালান প্রদাহের (Bovini Mastitis) স্থান থেকে প্রায় ১৫০ রকমের বীজাণু পৃথক করে নিয়ে পেনিসিলিন মিশ্রিত রক্তে প্রয়োগ করে দেখেছেন, বিভিন্ন প্রকার বীজাণু বিনাশের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ পেনিসিলিনের উপস্থিতির প্রয়োজন। আরো অনেক বিজ্ঞানকর্মী এই বিষয়ে গবেষণা চালান এবং সকলের ফলাফল সম্মিলিত করে নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, গবাদিপশুর পালান প্রদাহ সৃষ্টিকারী গ্রাম-পজিটিভ বীজাণুসমূহের উপরে পেনিসিলিনের কার্যকারিতা খুবই বেশি। গবাদি পশুর পালান প্রদাহের নিরাময়কল্পে পালানের মধ্যে একটি বিশেষ পরিমাণ পেনিসিলিনের উপস্থিতির

প্রয়োজন। ইনজেকসন করে পেনিসিলিনকে পশুদেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু ঐ ইনজেকসন করা হবে কোথায়? রোগাক্রান্ত অংশে পেনিসিলিনের পরিমাণ বেশি রাখবার জন্য সোজা পালানের মধ্যে ইনজেকসন করা চলে কিন্তু তা স্থানীয় টিস্যুসমূহের সামান্য ক্ষতিকারক বলে বিজ্ঞানীরা অন্য পন্থা অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিয়ান ও তাঁর সহযোগীরা শিরার মধ্যে এবং কানাডার গবেষকদ্বয় বার্কার ও ডাসণ্ট গোরুর পেশীর মধ্যে পেনিসিলিন প্রবেশ করিয়ে সুফল পেলেন না; তাই সোজাসুজি রোগাক্রান্ত অংশে এই ঔষধ প্রয়োগ করার ব্যবস্থাই প্রচলিত হল।

রোগাক্রান্ত গবাদিপশুর দেহে, পেনিসিলিন অতি পরিস্রুত বীজাণুশূন্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে কিছু সময় অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে, তা না হলে দুধে রোগ নিরাময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাণ্টিবায়োটিকের উপস্থিতি সব সময়েই থাকে না। দেখা গিয়েছে একবার বেশি পরিমাণ প্রয়োগ করার চেয়ে দৈনিক ২বার অল্প পরিমাণ পেনিসিলিন প্রয়োগ করার ফলাফল অনেক ভাল। পালান প্রদাহে ২৪ ঘণ্টা অন্তর ১০০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট পেনিসিলিন প্রয়োগ করে শতকরা মাত্র ৫০টি পশু আরোগ্যলাভ করেছে কিন্তু দিনে ২বার মাত্র ২০,০০০ ইউনিট পেনিসিলিন প্রয়োগের দ্বারা রোগমুক্ত গবাদি পশুর পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭৪ভাগ নানা প্রকার তেল এবং মোমের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় পেনিসিলিন প্রয়োগ করার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ, এই মিশ্রণ থেকে অ্যাণ্টিবায়োটিক খুব ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাই প্রয়োগের সময়ের ব্যবধান বেশি করলেও ক্ষতি হয় না। এডওয়ার্ড ও টেলর মোম ও তেলের সঙ্গে মিশ্রিত করে পরপর চারদিন দৈনিক ৪০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট পেনিসিলিন পালান প্রদাহ রোগাক্রান্ত প্রায় ৫৫টি গোরুর উপর প্রয়োগ করেছিলেন এবং তার মধ্যে শতকরা ৯৫ টি গোরু রোগমুক্ত হয়েছিল। অ্যালুমিনিয়ম স্টিয়ারেট-এর সঙ্গে প্রোকেন বেনজাইল

পেনিসিলিন-মিশ্রিত করে দেখা গিয়েছে, ৭২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। এই রোগ নিরাময়ে অরিওমাইসিনের কার্যকারিতাও খুব প্রবল। মাত্র ২০০ মিলিগ্রাম অরিওমাইসিনের একটি ইনজেকসন প্রয়োগে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে গবাদি পশু পালান প্রদাহ মুক্ত হয়। পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিনের একটি মিশ্রণও মাত্র একবার প্রয়োগে এই রোগ মুক্ত করতে সক্ষম।

স্ট্রেপটোমাইসিন যক্ষ্মা রোগ নিরাময় করে। কিন্তু গবাদিপশুর চিকিৎসায় যক্ষ্মারোগ নিরাময়কল্পে এই ঔষধের প্রয়োগ নেই বললেই চলে; কারণ ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত পশুর নিরাময় ঘটিয়ে পুনরায় তাকে ব্যবহার করা হয় না, তাই মানবসমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ঐ পশুকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুর আক্রমণরোধে পেনিসিলিন অক্ষম কিন্তু কোনো কোনো গবেষকের মতে পশুচিকিৎসায় স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুর আক্রমণ রোধ করার জন্য ১০ গ্রাম সালফোন-এর সঙ্গে ৫০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট পেনিসিলিন ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্টেফাইলোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর আক্রমণে গোরুর পালান আক্রান্ত হলে অরিওমাইসিন সহজেই রোগমুক্তি ঘটায়। স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুর আক্রমণে পালানের রোগাক্রান্ত অংশে অরিওমাইসিন ব্যবহার করে জানা গিয়েছে ৪৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনবার ২০০ মিলিগ্রাম করে অরিওমাইসিন প্রয়োগ করলে শতকরা ৯৬ ভাগ রোগের উপশম হয়। ব্যাকটিরিয়াম কোলি (Bactereum Coli) আরেক প্রকার বীজাণু, এও গবাদি পশুর পালানে প্রদাহ ঘটায়। বিজ্ঞানী শালম জানান যে, চারদিন, দিনে দুবার আধগ্রাম করে স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করলে রোগের প্রতাপ যায় কমে। নিসিন, আর একটি অ্যান্টিবায়োটিক পালানের প্রদাহে স্ট্রেপটোকক্কাস আগালাকাটিয়া বীজাণুর বিনাশে এও যথেষ্ট কার্যকর। ৫০,০০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট

নিসিন, দেহের রোগাক্রান্ত অংশে একবার প্রয়োগ করায়, শতকরা ৯৫টি প্রাণী রোগমুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আগেই বলে রাখি রোগবীজাণুর বিনাশের জন্য রক্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। দেহে প্রয়োগের পর থেকে সব সময়েই এই পদার্থ প্রস্রাবের সঙ্গে ও অন্যান্যভাবে দেহ থেকে নির্গত হয়। দেখা গিয়েছে জন্তু জানোয়ারের দেহের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্য ৫,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট প্রোকেন বেনজাইল পেনিসিলিন জলের সঙ্গে প্রয়োগ করলে রক্তে ২৪ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় পেনিসিলিন উপস্থিত থাকে। প্রয়োগের পর দেহমধ্যে স্ট্রেপটোমাইসিনের উপস্থিতির সময় কিন্তু খুবই কম। পশুর দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য যদি ৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগ করা হয় তা হলে তার ঔষধি ক্রিয়া মাত্র ৩ ঘণ্টা বর্তমান থাকে। ঔষধের প্রায় ৫০ থেকে ৮০ ভাগ প্রস্রাবের সঙ্গে বার হয়ে যায়। এই ঔষধ মুখ দিয়ে গ্রহণ করলে পাকস্থলীতে এর ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টা থাকে বটে; কিন্তু রক্তে একে পাওয়া যায় না। অবশ্য স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকসনের পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাছুরের দেহে এই ঔষধের ২৪ ঘণ্টা অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অরিওমাইসিন মুখ দিয়ে গ্রহণ করলেও প্রায় ২৪ ঘণ্টা পশুদেহের রক্তে একে পাওয়া যায়। শিরার মধ্যে ইনজেকসন দিলে এর কার্যকারিতা প্রায় ৬ ঘণ্টা থাকে।

প্রদাহ ছাড়া ঘোড়ার শ্বাসরোধ আর একটি কঠিন ব্যাধি। একপ্রকার স্ট্রেপটোকক্কাস বীজাণুর আক্রমণে এই রোগের আবির্ভাব। প্রশ্বাস নিতে ঐ প্রাণী অসাধারণ কষ্ট পায়, নাকমুখ দিয়ে ফেনা গড়ায়। পেনিসিলিনের ব্যবহার এই রোগ নিরাময়ে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। কানাডার বিজ্ঞানী ড্যামিউড ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত একটি ঘোড়াকে যথাক্রমে পেনিসিলিন এবং তৎপরে অ্যান্টিটক্সিন ইনজেকসন দিয়ে অতি শীঘ্র নীরোগ

করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইরিসিপেলাস আর একটি সাংঘাতিক রোগ, রাজহাঁস ও বড় বড় টার্কি মুরগীদের মধ্যে এর উপদ্রব খুবই বেশি। এই রোগ ঐ সব পাখিদের কাছ থেকে মানুষের মধ্যেও ছড়ায়। স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রয়োগ এই রোগে বিশেষ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। পেনিসিলিন ইনজেকসন ও তৎসঙ্গে রোগাক্রান্ত স্থানে পেনিসিলিন মলমের প্রয়োগও যথেষ্ট সুফলদায়ক। অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসাতেও পেনিসিলিন ব্যবহারের ফলাফল খুবই ভালো, কিন্তু স্ট্রেপটোমাইসিনের এই রোগনিবারণের ক্ষমতা পেনিসিলিনের প্রায় দ্বিগুণ।

গবাদি পশুর প্রজনন ক্রিয়ার সময় একটি বিশেষ বীজাণু ব্যাঘাত ঘটায়। বীজাণুটির নাম ভিবরিও ফোইটাস (Vibrio foetus) ; এর সংক্রমণে গাভী গর্ভধারণে অক্ষম হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ কর্তৃক দৈহিক পরীক্ষায় এই অস্বাভাবিকতার কোনো কারণ পর্যবেক্ষণ করা যায় না। স্ট্রেপটোমাইসিন এই বীজাণু ধ্বংস করতে সক্ষম; তাই উৎপাদন ক্রিয়ার পূর্বে প্রায় ১ গ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন, ২০০,০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট পেনিসিলিনের সঙ্গে গাভীর গর্ভাশয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ বীজাণুর ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সাফল্যের সঙ্গে রোধ করা সম্ভব। এই রোগের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবার জন্য বিজ্ঞানীরা আজকাল সংরক্ষিত তরল বীর্যের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ক্রিয়ার আশ্রয় নেন। বীর্য-সংরক্ষণের জন্যও অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব কম নয়। সামান্য পরিমাণে স্ট্রেপটোমাইসিন মিশিয়ে রাখলে বীর্য বহুদিন সতেজ ও বীজাণুশূন্য থাকে এবং দেখা গিয়েছে গাভীর সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শুধু বীর্যের চেয়ে অ্যান্টিবায়োটিক-সমন্বিত এই পদার্থের কার্যকর ক্ষমতা অনেক বেশি। স্ট্রেপটোমাইসিনের সঙ্গে সামান্য পেনিসিলিন মেশানো থাকলে আরো বেশি সুফল পাওয়া যায়। শুকর ও মুরগীর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সামান্য পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক তাদের খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বোতলের

দুধ এবং বাতাসশূন্য টিনের খাবারেও প্যাক করার আগে সামান্য পেনিসিলিন দিলে খাদ্যদ্রব্য বহুদিন সংরক্ষিত থাকে।

আমেরিকান সায়নামাইড কোম্পানীর কর্মকর্তারা ওহিয়োস্টেটের বিজ্ঞানী-বৃন্দকে নিয়ে এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন; সেই সভায় দুপ্রকার মাংস পরিবেশন করা হয়। একটি মাংস বেশ শক্ত এবং অপরটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও নরম। খানাপিনার টেবিলে জনৈক বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন, উভয় প্রকার মাংসই একই প্রাণীর দেহ থেকে কয়েকদিন পূর্বে নেওয়া হয়েছে। একভাগ সংরক্ষণের জন্য অরিওমাইসিন প্রয়োগ করে ৪৮ ঘণ্টা পরে বরফের মধ্যে রাখা হয় এবং অপরভাগ প্রাণীকে বধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরফে সংরক্ষিত করা হয়। অরিওমাইসিন-এর সাহায্যে সংরক্ষিত মাংসটি নরম আছে এবং অপরটি শক্ত হয়ে গেছে। কাঁচা মাছ, মাংস ও অন্যান্য তরিতরকারী সংরক্ষণের জন্য সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে অসাধারণ সুফল পাওয়া গেছে। প্রাণীকে বধ করার পর, তার রক্তবহনকারী নালীর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এর ফলে প্রাণীটির মাংস কেবলমাত্র ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করার চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে। সংরক্ষণের জন্য অরিওমাইসিনের কার্যক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বেশি, টেরামাইসিন ও স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। যে সব বীজাণু বৃদ্ধিলাভ করে খাদ্যের পচনক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, অ্যান্টিবায়োটিক-সমূহের উপস্থিতি তাদের বিনাশ ঘটায়। অরিওমাইসিন মিশ্রিত বরফের মধ্যে মাছ সংরক্ষিত করা হয়, এর দ্বারা তাদের স্বাদ ও গন্ধ কেবলমাত্র বরফের দ্বারা সংরক্ষিত মাছের চেয়ে অনেকদিন বেশি অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গবেষণা করে দেখেছেন, সংরক্ষণের কাজে যে সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয় তা খাদ্য গ্রহণের সময় শরীরে প্রবেশ করে কোনোপ্রকার ক্ষতি করে না। রোগের চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অরিও-মাইসিন প্রতিদিন মানবদেহে প্রয়োগ করা হয় সেই পরিমাণ অরিওমাইসিন

প্রায় ১০টন সংরক্ষিত মাছের মধ্যে অবস্থান করে। অতএব মানুষ প্রতিদিন যে পরিমাণ মাছ গ্রহণ করে তাতে কত সামান্য অ্যান্টিবায়োটিক থাকে তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। রান্নার সময় উত্তাপে ঐ সামান্য অ্যান্টি-বায়োটিকটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। বিজ্ঞানীমহল আশা করেন, সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ প্রচলিত হলে খাদ্যশিল্পে এক নতুন যুগের আবির্ভাব হবে।

উদ্ভিদজগতে অ্যান্টিবায়োটিক

মানুষ সামান্য কয়েক বছর আগে উদ্ভিদজগতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছিল, সেই গবেষণার ফলাফল আজ শাখাপল্লবিত হয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে।

উদ্ভিদদেহে অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ঔষধের সহজ সঞ্চালনের ক্ষমতা লক্ষ্য করেই বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদজগতে রোগের আক্রমণরোধের প্রচেষ্টায় এই অতুলনীয় ঔষধ প্রয়োগ করেন। উদ্ভিদের শিকড়কে অ্যান্টিবায়োটিক দ্রবণে ভিজিয়ে রেখে নির্দিষ্ট সময় পর পর ঐ উদ্ভিদের পাতায় এর পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচার করা হয় কি সময়ে কত পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভিদদেহে সহজভাবে সঞ্চালিত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা শসাগাছ-জাতীয় গাছের দেহে বিভিন্ন অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধ সঞ্চালনের পরিমাণ পরিমাপ করতে গিয়ে দেখেছেন এই উদ্ভিদ-দেহ অরিওমাইসিন, নিওমাইসিন এবং টেরামাইসিন ইত্যাদি ঔষধ মোটেই গ্রহণ করতে পারে না; ক্লোরোমাইসেটিন যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে এবং স্ট্রেপটোমাইসিন সঞ্চালনের পরিমাণ রীতিমত বেশি। ঐ উদ্ভিদদেহে সহজ সঞ্চালনের ফলে কিছু সময় পরে স্ট্রেপটোমাইসিনের পরিমাণ ঐ অ্যান্টি-বায়োটিক দ্রবণের চেয়েও বেশি হয়ে যায়, কিন্তু ক্লোরোমাইসিটিনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সঞ্চালনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হওয়া সত্ত্বেও সঞ্চয়ের পরিমাণ কোনো

সময়েই সরবরাহকারী অ্যান্টিবায়োটিক দ্রবণের চেয়ে বেশি হয় না। বিজ্ঞানীদের মতে শস্যগাছ-জাতীয় ঐ উদ্ভিদদেহে স্ট্রেপটোমাইসিন সহজ সঞ্চালনের পরে জমা হয়, কিন্তু ক্লোরোমাইসেটিন জমা হতে পারে না, তাই সঞ্চয়ের বেলায় এত পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদদেহ কোনো অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ঔষধ একেবারে গ্রহণ করে না একথা জোর করে বলা কঠিন। কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের উদ্ভিদদেহে অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সাধারণভাবে উদ্ভিদদেহে অ্যান্টিবায়োটিকের সহজ সঞ্চালনের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনেকাংশে সরবরাহকারী মাধ্যমের উপর নির্ভর করে। যেমন টম্যাটো ও কলাই-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে ক্লোরোমাইসেটিন দ্রবণ বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োগের পরে প্রমাণিত হয়েছে যে ঐসব উদ্ভিদের পাতায় সঞ্চারিত ক্লোরো-মাইসেটিন সরবরাহকারীর উপর নির্ভরশীল। অবশ্য সঞ্চালনের এই পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট আইন মেনে চলে না— সবই নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের চরিত্রের উপর।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে টম্যাটো এবং কলাই এই উভয় জাতীয় উদ্ভিদের পুরোনো কোষগুলি নতুন কোষগুলির চেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে পারে। ঘটনাটি কিন্তু একটু নতুন ধরনের ; সাধারণত দেখা যায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি গ্রহণের বেলায় উদ্ভিদের নতুন কোষগুলিই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। কারণ বৃদ্ধির জন্য যে-কোনো প্রকার পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন তাদের সবচেয়ে বেশি। কি কারণে অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ঔষধ এরূপ ব্যবহার করে তা নির্দিষ্টভাবে বলা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগানে মড়ক লাগল। বীজাণুর আক্রমণে বাগানের সব ফুল শুকিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নিউজার্সির এগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশনে শুরু হল গবেষণা। দেখা গেল এই রোগের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন এবং টেরামাইসিন এই তিনটি

ঔষধই বিশেষ কার্যকর; কিন্তু শেষের দুটি উত্তেজক হওয়ার জন্য স্ট্রেপটোমাই-সিন ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা সুফলদায়ক। যে কলম থেকে এই ফুলের গাছের সৃষ্টি হয় জীবাণুর দ্বারা সেই কলমগুলিই সংক্রামিত হয়েছে, সুতরাং কলমের টুকরোগুলিকে কয়েকঘণ্টা স্ট্রেপটোমাইসিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলেই তারা বীজাণু শূন্য হয়ে নীরোগ গাছের সৃষ্টি করবে। দেখা গিয়েছে রোগের চিহ্ন উদ্ভিদদেহে পরিস্ফুট হবার পরও অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের প্রভাব তাদের উপর সহজেই কার্যকর হয়। রোগের প্রকোপ বিবেচনা করে অ্যাণ্টিবায়োটিকের পরিমাণ বাড়িয়ে উদ্ভিদ ও ফুলের দেহে এই শ্রেণীর রোগ প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব। কলম কেটে অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজনও হয় না। মাটিতে যদি ঐ ঔষধ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে উদ্ভিদসমূহ মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই পদার্থ গ্রহণ করে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগাতে পারে। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই কয়েকটি কোম্পানী জমিতে দেবার জন্য অ্যাণ্টিবায়োটিক স্প্রে প্রস্তুতকল্পে মনোযোগ দিয়েছেন।

উদ্ভিদের ধসা রোগ বড়ই সাঙ্ঘাতিক। রোগের আক্রমণে মনে হয় গাছটা কে যেন মুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ইউনাইটেড স্টেটস্ 'ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার'-এর 'ব্যুরো অব প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাস্ট্রির' বিজ্ঞানী মিচেল ও তাঁহার সহকর্মীরা কলাই গাছের ধসা রোগের চিকিৎসায় অ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রভাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন স্ট্রেপটোমাইসিন ও লানোলিন-মিশ্রিত একটি মলমের পাতলা আবরণ কলাই গাছের পাতা ও বোঁটায় প্রয়োগ করলে এই রোগের সৃষ্টি হয় না। মাত্র আটঘণ্টার মধ্যেই ঐ উদ্ভিদ, মলম থেকে যথেষ্ট পরিমাণে স্ট্রেপটোমাইসিন দেহমধ্যে গ্রহণ করতে পারে; অবশ্য এই মূল্যবান মলম কৃষকদের পক্ষে ব্যবহার করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তাই বিজ্ঞানী মিচেল শস্যক্ষেত্রে স্ট্রেপটোমাইসিন 'স্প্রে' ব্যবহার করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। দেখা গিয়েছে শতকরা মাত্র একভাগ স্ট্রেপটোমাইসিন দ্রবণ জমিতে ৪।৫ বার 'স্প্রে' করলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আর

হয় না। ঠিক এইভাবেই মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানী গুডম্যান সাহেব একবার ফল ব্যবসায়ীদের চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। 'ফায়ার ব্লাইট' রোগের আক্রমণে আপেল আর নাসপাতির বাগান ধ্বংস হতে বসেছে। ব্যবসায়ীরা মাথা চাপড়াচ্ছেন আর নানাভাবে চেষ্টা করছেন গাছগুলো বাঁচাবার জন্য। তামাঘটিত যৌগিক পদার্থ, তামা গুঁড়ো অনেক কিছুই প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু ফলাফল মোটেই আশাপ্রদ নয়। বরং এই পদার্থগুলিই ফল ও গাছের বেশ মোটারকম ক্ষতি করছে। 'ফায়ার ব্লাইট' রোগের জীবাণুর আক্রমণে গাছের শাখা, পাতা, কুঁড়ি সবকিছুই কালো অথবা বাদামী হয়ে যায়। গুডম্যান সাহেব দেখলেন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের চিকিৎসায় এই রোগ সহজেই দমন করা সম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হল স্ট্রেপটোমাইসিন ও টেরামাইসিনের একটি মিশ্রণ এই রোগ দমন করতে পারে। এই মিশ্রণটির রোগনিবারণের জন্য উদ্ভিদদেহ ভেদ করা প্রয়োজন তাই 'স্প্রে' করার জন্য দ্রবণ হিসাবে মিথাইল সেলোসল্‌ভ ব্যবহার করা হল। আপেল ও নাসপাতির বাগানও নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এইসব ফলের চাষে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

হেলিক্সিন আর গ্রিসিওফুলভিন আর দুটি অ্যান্টিবায়োটিক, উদ্ভিদদেহে ছত্রাক জাতীয় রোগের প্রভাব রোধ করার জন্য এরা খুবই কার্যকর। টম্যাটোর 'আর্লি ব্লাইট' নামক এক প্রকার ছত্রক-ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে হেলিক্সিন প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়েছে। এই রোগে টম্যাটো গাছের পাতায় দেখা দেয় ছোট ছোট বাদামী দাগ এবং ধীরে ধীরে পাতা হলদে হয়ে যায়। 'স্প্রে' করে হেলিক্সিন প্রয়োগের দ্বারা এই রোগ প্রায় সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী ব্রিয়ান ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৫১ সালের ৩রা মার্চ 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনা মারফৎ উদ্ভিদদেহে

'গ্রিসিওফুলভিন'-এর সঞ্চালন ও তার প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, ব্যবহারিক গুণাবলী বিচার করলে দেখা যায় উদ্ভিদদেহের চিকিৎসায় গ্রিসিওফুলভিন কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। টম্যাটোর 'আর্লি ব্লাইট' রোগের চিকিৎসায় হেলিক্সিন প্রয়োগে তাড়াতাড়ি ওপর ওপর রোগ নিরাময় হয় বটে, কিন্তু নিয়মসঙ্গত চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য গ্রিসিওফুলভিন বেশি কার্যকর।

গাছের দেহের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিকের সৃষ্টি হয় এবং তার সাহায্যে গাছ নানাপ্রকার রোগজীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। গবেষণার ফলস্বরূপ জানা গিয়েছে অনেক উদ্ভিদই দেহমধ্যে এমন রসায়ন দ্রব্যের সৃষ্টি করে যা কোনো কোনো উদ্ভিদরোগের বীজাণুর পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রায় ১৯২০ সাল থেকে এই বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। এখানে সে সম্বন্ধে দু-চার কথা পরিবেশন করা হবে।

পেঁয়াজ কালো হয়ে শুকিয়ে যায়, এর জন্য দায়ী বিশেষ ধরনের একটি জীবাণু (Colletotrichum Circiuans)। উইসকনসিনের বিজ্ঞানীদ্বয় ওয়াকার ওলিঙ্ক পর্যবেক্ষণ করলেন লাল রং-সমন্বিত পেঁয়াজের সাদা পেঁয়াজের চেয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশি। তাঁরা ঐ লাল রং থেকে ক্যাটিচল ও প্রোটাক্যাটিচোইক অ্যাসিড নামক দুটি রসায়ন দ্রব্যও পৃথক করতে সমর্থ হলেন এবং দেখা গেল এই দুটি পদার্থ ঐ রোগ বীজাণুর ক্ষতি করতে সক্ষম। আর একটি বীজাণুর (Phymatotrichum Omnivorum) আক্রমণে তুলো গাছের শিকড় যায় শুকিয়ে কিন্তু গম, বার্লি, পেঁয়াজ ইত্যাদি গাছের কোনো ক্ষতিই হয় না। এমন-কি গম বা বার্লি গাছের শিকড়ের রস ছেঁচে ঐ বীজাণুর উপর প্রয়োগ করলেও তারা বিনষ্ট হয়। বিজ্ঞানীরা ঐ উদ্ভিদদেহে অ্যান্টি-বায়োটিকের উপস্থিতিই এই প্রতিরোধ-ক্ষমতার কারণ বলে মনে করেন।

সাধারণত রোগাক্রান্ত চারাকে সমূলে বিনষ্ট করে, রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের

সংস্পর্শে নীরোগ চারাকে আসতে না দিয়ে, জমিতে ও উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন রসায়ন দ্রব্য প্রয়োগ করে, রোগের বীজাণু-ধ্বংসকারী অন্য বস্তুর আবির্ভাব ঘটিয়ে উদ্ভিদজগতের রোগকে আয়ত্তে রাখা হয়। বিবেচনা করলে দেখা যায় এতে ফল হয় ওপর ওপর, কিন্তু খরচও এমন কিছু কম হয় না। একমাত্র আমেরিকাতেই উদ্ভিদরোগের প্রকোপ-নিবারণকল্পে বছরে কম করেও প্রায় ১৬-১৭ কোটি টাকার রসায়ন দ্রব্য লাগে। এই রসায়ন দ্রব্যের ব্যবহারে ক্ষেত্র-বিশেষে ফল, ফুল ও শস্যও নেহাৎ কম বিনষ্ট হয় না। অ্যান্টিবায়োটিকের বর্তমান মূল্য এবং সামান্য পরিমাণে প্রয়োগের দ্বারা অসাধারণ সুফলের কথা বিবেচনা করেও মনে হয় উদ্ভিদরোগের নিরাময়কল্পে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ব্যয়াধিক্যের জন্যই সব সময় লাভজনক না হতেও পারে। মোটামুটি দেখা গিয়েছে উদ্ভিদরোগে অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ট্রেপটোমাইসিন কার্যকর; আমেরিকার জনৈক কৃষিবিজ্ঞানীর মতে ফলের চাষে বর্তমান মূল্যে স্ট্রেপটোমাইসিনের ব্যবহার মোটেই ক্ষতিজনক নয়। তবে শস্যক্ষেত্রে ও ফুলের বাগানে এদের প্রয়োগ লাভজনক হবে কি না তা তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেন না।

আর একটি সমস্যাও বিজ্ঞানীদের বিচলিত করে তুলেছে। ফলের চাষের সময় অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ব্যবহার করা হলে উৎপাদিত ফলেও এই বস্তু থেকে যাবে এবং কাঁচাফল গ্রহণের সময় প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেহে প্রবেশ করবে। এতে হিতে হবে বিপরীত— উদ্ভিদদেহের রোগ নিরাময় করতে গিয়ে আমরা আমাদের দেহে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি করব, ফলে মানুষের অসুখের সময় এই অতুলনীয় ঔষধের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হবে।

অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ কিভাবে উদ্ভিদদেহে রোগ নিরাময় করে তা বলা আজও বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দেখা গিয়েছে একই বীজাণু এক

শ্রেণী উদ্ভিদদেহে স্ট্রেপটোমাইসিন-কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং অন্যশ্রেণীর উদ্ভিদদেহে তার ওপর স্ট্রেপটোমাইসিনের কোনো প্রভাবই নেই। টেস্টটিউবের মধ্যে যে বীজাণুকে কোনো একটি অ্যাণ্টিবায়োটিক ধ্বংস করতে পারে না তাকে উদ্ভিদদেহে সে অক্লেশেই বিনাশ করে ফেলে। সব কার্যকারণই যেন ঘটছে বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন্ অ্যাণ্টিবায়োটিক, কোন্ উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ বীজাণু আক্রমণ রোধ করতে পারে তা পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ না করে বলা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। উদ্ভিদদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিকের কোনো বিশেষ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায় নি। অনেক অল্পমূল্যের অ্যাণ্টিবায়োটিক জানা আছে যা নানাপ্রকার বীজাণু বিনাশে যথেষ্ট কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও মানবদেহের ক্ষতিকারক বলে ব্যবহৃত হয় না। উদ্ভিদদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিকসমূহের বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ দেখে বিজ্ঞানীরা মানবদেহের পক্ষে উত্তেজক এইসব পদার্থ উদ্ভিদজগতের চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা চলবে কি না তা নির্ধারণকল্পে মনোনিবেশ করেছেন।

উপসংহার

উপসংহারে ভারতীয় অ্যাণ্টিবায়োটিক-শিল্পবিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করা দরকার মনে করছি। মানবকল্যাণে অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্রম-বর্ধমান চাহিদা দেখে প্রত্যেক সভ্য দেশই নিজেদের প্রয়োজন-অনুসারে এই জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতকল্পে অগ্রণী হয়েছেন। ভারত-সরকারও পেছিয়ে নেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ মহলের সহযোগিতায় তাঁরাও গড়ে তুলেছেন বিশাল এক পেনিসিলিনের কারখানা যেখানে ভারতের প্রয়োজনীয় পেনিসিলিনের এক বিরাট অংশ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

পেনিসিলিন প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষে আলোচনা ও চেষ্টা শুরু হয়েছে অনেকদিন। ১৯৪৫ সালে ভারত-সরকার দেশে রসায়ন দ্রব্য এবং ঔষধ প্রস্তুতের

জন্য যে কমিশন গঠন করেন, তাঁরা ভারতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুতের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। পেনিসিলিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা কল্পনা করে তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন যে, অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সরকারী প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে পেনিসিলিন তৈরি শুরু করা দরকার। সে সম্পর্কে যান্ত্রিক ও অন্যধরনের যে সকল শিল্প-কৌশল জানা প্রয়োজন, সে সময় এদেশে তা একেবারেই ছিল অজানা। তাই অনেকেই কমিশনের এই সুপারিশকে অবাস্তব বলে উপহাস করেছিলেন। কমিশন পেনিসিলিন-শিল্প-বিষয়ক জ্ঞান আহরণের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিদেশে প্রেরণের প্রস্তাবও করেছিলেন।

যাই হোক, সেই সুপারিশ অনুযায়ী ভারত-সরকার ১৯৪৬ সালে মেজর জেনারেল সোখে এবং ডা. গণপতিকে এই বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য ইংলণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে জানালেন যে, ভারতবর্ষে পেনিসিলিন প্রস্তুত কেবলমাত্র সম্ভবই নয়, শিল্পপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভজনক বটে। এই প্রসঙ্গে ১২লক্ষ মেগাইউনিট (এক মেগা — দশ লক্ষ) পেনিসিলিন তৈয়ারির ক্ষমতাসহ একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টাও হতে লাগলো। কিন্তু তার পরই ভারত-সরকারের পরিকল্পনার জোয়ারে ভাঁটা পড়লো, দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও চিন্তার পর যখন তাঁরা কাজে হাত দিতে গেলেন তখন জগতের অ্যান্টিবায়োটিক শিল্প আরও এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে থাকলে চলবে না। তাই পরিকল্পনার চিন্তাধারা জগতের অগ্রগতির সঙ্গে সমকালীন করে মিলিয়ে নেবার জন্য আবার মেজর জেনারেল সোখে, ডা. গণপতি এবং ডা. শঙ্করণকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনা করতে নিযুক্ত করা হল। কমিটির মতামত পাওয়া গেলে ভারত-সরকার কাজে নামলেন। ঠিক হল বোম্বাই-সরকার, ভারত-সরকার এবং কোনো-একটি বিখ্যাত সুইডিশ কোম্পানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে একটি পেনিসিলিন কারখানা স্থাপন

করা হবে। এই তিনটি পক্ষের প্রতিনিধিসমন্বয়ে কার্যপরিচালনার জন্য একটি কার্যকর পরিষদ গঠন করা হল। ঐ সভার সভাপতি হলেন শ্রী এন. এস্. ওয়াদিয়া।

কিছুদিন পরেই ভারত-সরকারের অ্যাণ্টিবায়োটিক তৈরির পরিকল্পনায় এক বিরাট পরিবর্তন এল, দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে ভারত-সরকারকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন। আন্তর্জাতিক-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান (W. H. O.) জানালেন, তাঁরা ভারত-সরকারকে পেনিসিলিন-শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে পরামর্শ দেবেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে কারিগরী জ্ঞানলাভের সাহায্য করবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শিশুসাহায্যভাণ্ডার (U. N. I. C. E. F.) এই কারখানা নির্মাণের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সম্মত হলেন। তার পর আর সুইডিশ্ কোম্পানির সাহায্যের প্রয়োজন নেই, ভারত-সরকার একাই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারবেন। ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সমিতি গেল ভেঙে, বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি বাতিল হল। ৯০ লক্ষ মেগাইউনিট পেনিসিলিন তৈরির উপযোগী একটা কারখানার পরিকল্পনা গৃহীত হল। কাজ শুরু হল ১৯৫১ সাল থেকে, উৎপাদন শুরু হল ১৯৫৩ সালের শেষে। ১৯৫৫ সালে উন্নত ধরনের প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদন প্রায় ২ কোটি মেগাইউনিটে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে ১৯৪৯ সালে পেনিসিলিন ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ মেগাইউনিট আর ১৯৫৫ সালে চাহিদা হয়েছে ২॥ কোটি মেগাইউনিট, সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে পেনিসিলিন উৎপাদনের পরিকল্পনা সামান্য সম্প্রসারণের দ্বারা নিজেদের চাহিদা আমরা নিজেরাই পূরণ করতে পারি। এই শিল্পের মাধ্যমে আমরা প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে,

ভারতবর্ষে পেনিসিলিনের ব্যবহার আরও বর্ধিত হয়ে যদি ৮ কোটি মেগা-ইউনিটেও দাঁড়ায় পিম্পরীর হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক কারখানাটির সম্প্রসারণের দ্বারা উৎপাদন বর্ধিত করে, দেশের এই প্রয়োজন সহজেই মেটানো যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বর্তমানে পৃথিবীতে পেনিসিলিন উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি মেগাইউনিট।

পেনিসিলিন অথবা অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধসমূহের প্রচার ও প্রসার খুব বেশি দিনের কথা নয়, উন্নতি যা কিছু ঘটেছে তা খুবই কম-সময়ের মধ্যে। তাই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো কাঁচামালের ব্যবহারের প্রয়োজনও গিয়েছে বদলে। আজকে যা প্রয়োজন, পদ্ধতির উন্নতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে আগামীকাল আর সে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়তো থাকে না।

পেনিসিলিন পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের ছত্রক-জাতীয় উদ্ভিদ থেকে। অতএব এই উদ্ভিদের সৃষ্টিই এই শিল্পের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কার্য। ছত্রকটির নাম পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম। এর বীজ আমাদের দেশে সৃষ্টি করা হয় বালির উপর। তার পর ঐ বীজ বপন করা হয় বিশেষ অবস্থায় রক্ষিত একটি বীজাধারের মধ্যে যেখানে তারা প্রয়োজনীয় পরিবেশের সহায়তায় পরি-বর্ধিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে ছত্রাকদেহ সৃষ্টি করে। বীজাধারগুলি মরিচাবিহীন ইস্পাত দ্বারা নির্মিত এবং এর আয়তন প্রায় ৮০ ঘন ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫০০ গ্যালন পরিমাণ পদার্থ এই বীজাধারে রাখা যায়। এর মাঝখানে থাকে জড়ানো নল যার মধ্যে দিয়ে গরম অথবা ঠাণ্ডা জল চালিয়ে বীজাধারটিকে খুশিমত যে কোনো উত্তাপে রাখা সম্ভব। বাতাসের চাপ নির্দিষ্ট রাখবার জন্যও এর তলা দিয়ে উচ্চ চাপে বাতাস প্রবেশ করবার ব্যবস্থা থাকে। বিশুদ্ধ বাতাস তলা দিয়ে উচ্চ চাপে প্রবেশ করিয়ে ঐ বীজাধারের অভ্যন্তরে উচ্চ চাপ রক্ষা করার প্রধান উদ্দেশ্য হল বাইরের বাতাসের দূষিত সংস্পর্শ থেকে পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনামকে রক্ষা করা। বীজাধারের ভিতরকার পদার্থসমূহ

ভালোভাবে মিশ্রিত করবার জন্য একটি শক্তিশালী নাড়ানীরও ব্যবস্থা থাকে। পাশেই থাকে একটি কাঁচের জানালা, যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে পারেন। বীজাধারের অভ্যন্তরে ঐ জাতীয় উদ্ভিদের খাদ্যহিসাবে যে তরল পদার্থ রাখা হয় তাতে সুক্রোজ থাকে শতকরা ২ ভাগ এবং শস্য ভেজানো ঘন পদার্থও থাকে প্রায় শতকরা ২ ভাগ। এই মিশ্রণেই বৃদ্ধি পাবে ঐ ছত্রক। তাই বীজ রোপণ করবার পূর্বে ১২০ ডিগ্রী উত্তাপে একে শোধন করে নেওয়া হয় এবং তৎপরে ভিতরকার জড়ানো নলের সহায়তায় ঠাণ্ডা জল চালিয়ে উত্তাপ রক্ষা করা হয় ২৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে।

বীজাধারে সৃষ্ট ছত্রকদেহ, পেনিসিলিন প্রস্তুতির জন্য আর একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানেই শুরু হয় পচনক্রিয়া। এই কক্ষটি বীজাধারেরই একটি বৃহৎ সংস্করণ এবং ব্যবস্থাসমূহ প্রায় সবই এক। যার মাধ্যমে পচনক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাতে শস্য ভেজানো ঐ তরল পদার্থ থাকে শতকরা প্রায় ১ ভাগ, বাদাম গুঁড়া থাকে শতকরা প্রায় ৩ ভাগ, ল্যাকটোজ্ থাকে শতকরা প্রায় ৩½ ভাগ এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে শতকরা প্রায় ½ ভাগ। এই বস্তুগুলিকে অন্য একটি আধারে মিশিয়ে তার পর পচনকক্ষে নিয়ে আসা হয়। পচনক্রিয়ার ফলে সমস্ত বস্তুটি গাঁজিয়ে উঠে যে ফেনার সৃষ্টি করে তার বিনাশের জন্য শতকরা তিন ভাগ অক্টাডেকানল-মিশ্রিত বাদাম তেল দেওয়া হয়। পেনিসিলিন অণুর ফিনাইল্যাসিটেট্ অংশ সংযোজনের জন্য পচনক্রিয়া শুরু হবার ২০ ঘণ্টা পরে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর হিসাবমত সোডিয়াম ফিনাইল্যাসিটেট একটি নলের সাহায্যে ক্রিয়ারত মিশ্রণের মধ্যে এসে পড়ে। পচনক্রিয়া সমাপ্ত হবার জন্য সময় লাগে সর্বসমেত প্রায় ৭০ ঘণ্টা থেকে ১০০ ঘণ্টা। এর পর কাজ হল ছাঁকা। পচনক্রিয়ার মিশ্রণের তরল অংশতেই বিরাজ করছে পেনিসিলিন, যার পরিমাণ ওজন অনুসারে ঐ তরল অংশের প্রায় হাজার ভাগের এক ভাগ। একটি ঘূর্ণীয়মান বায়ুশূন্য ছাঁকনির সাহায্যে

পেনিসিলিন-সমেত পচনক্রিয়ার তরল অংশটিকে আলাদা করে ফেলে নিয়ে যাওয়া হয় সংরক্ষণ কক্ষে। তার পর শুরু হয় নিষ্কাশনের প্রস্তুতি। এই তরল পদার্থটিতে অ্যাসিড এবং বুটাইল্যাসিটেট্ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক নিষ্কাশনীর সাহায্যে ঐ বুটাইল্যাসিটেট্ অংশটিকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই অংশের মধ্যেই চলে আগে পেনিসিলিন এবং এর থেকে পটাসিয়াম অ্যাসিটেটের সহায়তায় পাওয়া যায় পেনিসিলিনের পটাসিয়াম সল্ট। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পটাসিয়াম পেনিসিলিনকে বার বার শোধন করে বিশুদ্ধ করা হয় অথবা এর থেকে প্রস্তুত করা হয় সোডিয়াম পেনিসিলিন ও প্রোকেন পেনিসিলিন। সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম পেনিসিলিন উত্তাপের দ্বারা সহজেই পরিশোধিত এবং জীবাণুশূন্য হয়, কিন্তু প্রোকেন পেনিসিলিনে তাপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একে প্রস্তুত করতে হয় বীজাণুশূন্য পরিবেশেই। এর পরের কাজ হল বায়ুশূন্য বোতলে পুরে, মুখে টিনের চাকৃতি আটকে দেওয়া, অবশ্য বোতলে ভর্তি করবার আগে নিয়ম অনুযায়ী ঔষধটির গুণাগুণ ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার।

কাঁচামাল ছাড়াও পরিবেশের আরও কয়েকটি সাহায্য পেনিসিলিন বা যে কোনো অ্যাণ্টিবায়োটিকশিল্পে অত্যাবশ্যক, যেমন সুবিধা দরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ, উচ্চ চাপে বাতাস ও জল। সব দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় পিম্পরী পেনিসিলিন উৎপাদনের কারখানার স্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাছেই রয়েছে নদী— তা থেকে জল আসে, ঐ জলকে তেলের আগুনের উত্তাপে বয়লারের সাহায্যে বাষ্প করা হয়। বাষ্প তৈরি করা হয় প্রতি বর্গইঞ্চিতে ২ মণেরও বেশি উচ্চ চাপে এবং পরে প্রয়োজন অনুযায়ী চাপকে কমিয়ে নেওয়া হয়। কারখানায় প্রতিদিন জল লাগে প্রায় ৪০ লক্ষ গ্যালন। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করেন টাটা বিদ্যুৎ কোম্পানী তাঁদের জলবিদ্যুৎ সৃষ্টির কেন্দ্র থেকে, আর উচ্চ চাপে বাতাস

সৃষ্টি করা হয় দুটি বিরাট চাপযুক্ত বাতাস সৃষ্টির যন্ত্র-দ্বারা।

বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা, ভারত-সরকার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এঁরা কেবলমাত্র আমাদের দেশে একটি অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ প্রস্তুতই করছেন না, গবেষণা ও চর্চার দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিক শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

গবেষণাকে বাদ দিয়ে চলবার চেষ্টা করলে যে-কোনো শিল্পই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পেছিয়ে পড়ে, উৎপাদনের মানের উৎকর্ষ একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে স্থির হয়ে যায়। তাই আমেরিকার ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের বাৎসরিক বিক্রয়ের প্রায় শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ টাকা গবেষণার জন্য নিযুক্ত করেন। পিম্পরী পেনিসিলিন প্রস্তুত কারখানার গবেষণা-মন্দিরটি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির কোনো অভাব যাতে না থাকে সেদিকেও সর্বরকমে ব্যবস্থা করতে উদ্যোক্তারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। কয়েকজন গবেষক ও কর্মী এখানে রসায়ণ ও ছত্রকবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন।

মোটামুটি আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হল। ১৯৫৬ সালের ৩১শে মে ভারত-সরকারের উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী কে. সি. রেড্ডি, পিম্পরী কারখানায় স্ট্রেপটোমাইসিন প্রস্তুত করার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ১৬ই জুলাই লোকসভায় জানান যে, 'সরকার ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি স্থাপন করবেন এবং ভারতবর্ষের প্রয়োজন অনুসারে অবিলম্বেই ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ কিলোগ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতি বৎসরে উৎপন্ন হবে।'

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়

ইতিহাস ২.৫০, ৩.০০

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২.৩০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২.৩০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয়

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২.৩০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১.৫০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২.০০

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩.৩০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১.৫০

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩.০০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২.৫০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ ২.৫০, ৩.০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজাপার্বণ ৩.০০, ৪.০০